শয়নযান

ভাস্কর চক্রবর্তী

শয়নযান

ভাস্কর চক্রবর্তী

প্যাপিরাস
২, গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০০০৪

প্রকাশঃ আশ্বিন ১৪০৫। সেপ্টেম্বর ১৯৯৮
প্রচ্ছদঃ দেবব্রত ঘোষ

পঁচিশ টাকা

প্যাপিরাস-পক্ষে অরিজিৎ কুমার, ২ গণেন্দ্র মিত্র লেন কলকাতা ৪
কর্তৃক প্রকাশিত ও টেক্নোপ্রিন্ট, ৭ সৃষ্টিধর দত্ত লেন কলকাতা ৬ থেকে মুদ্রিত

(মুদ্রিত বইটি পাঠ করে, ভালোবেসে, বর্তমান বৈদ্যুতিন সংখ্যাটির হরফবিন্যাস করা হল। বস্তুত নিজস্ব কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও ভবিষ্যতে পুনঃপাঠের সুবিধার কারণেই এই প্রয়াস। সহৃদয় পাঠকের/পাঠিকার নিকট বিনম্র নিবেদন, পাঠপূর্বে স্বত্বাধিকারীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করে নেবেন। হরফবিন্যাসে মূল বইটিকে যথাসম্ভব অবিকল রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বৈদ্যুতিন সংখ্যাটির কোনও প্রকার প্রমাদের জন্য আমারই অজ্ঞতা দায়ী, লেখক বা প্রকাশকের নয়।
হরফবিন্যাসঃ কেশবচন্দ্র দাস, ৩ বঙ্কিমনগর, আতপুর, উত্তর ২৪ পরগণা,পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭৪৩১২৮)

সুমন্ত মুখোপাধ্যায়

অভীক বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু

ভূমিকা

কোনো গল্প না, উপন্যাসও নয়। তবে কি স্মৃতিকথা কোনো ? জার্নাল? ঐরকমই হবে কিছু একটা। লেখার কথা ছিল কবিতা, লিখে ফেললাম ঘোড়া, মৃত্যু, নদীর কথা। অসুখের কথা। বই আর তাসুড়েদের কথা। প্রেম আর কবিতার কথা। ছেলেবেলার কথা। এখনকার কথাও।

কবিতা লেখেন এমন যে কেউই লিখতে পারতেন এই লেখা। যে লেখা, বিশেষত, 'ব্যক্তিগত হাওয়া'য় ঝিম মেরে আছে।

একটা পুরস্কার জুটেছিল হঠাৎ। দিল্লির। কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের। সেই পুরস্কারের কথানুযায়ী এই লেখা। ঐ সংস্কৃতি বিভাগের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আর কৃতজ্ঞ, অরিজিৎ কুমারের কাছে যিনি বেস্ট-সেলারের দু-একশো কিলোমিটার দূরের এই বইও প্রকাশে উৎসাহী হলেন।

ভাস্কর চক্রবর্তী

১

যদি না-জিততে পার তো জিতো না, কিন্তু তুমি হেরেও যেও না তা' বলে।

এমন একটা মোলায়েম কথা নিজের মনে আওড়াতে আওড়াতে হাঁটছিলাম আমি। আমার মাথা আজকাল তেমন আর কাজ করে না। বড়োই মন্থর হয়ে এসেছে। তবুও বুঝতে পারছিলাম আমি, এক টুকরো হাসি ভেসে উঠল আমার মুখে, যখনই আবার মনে পড়ল কথাটা।

—অমীমাংসিত খেলা ?

নিজের মনেই কথাটা আমি তরতরিয়ে ছুঁড়ে দিলাম নিজের দিকে। যে অল্পতেই ধ্বসে যাই আমি, সেই আমার আজ হলোটা কী? মজা করছি? ঠাট্টা-রসিকতা করছি? রাস্তায় অবশ্য যখন বেরোয় মানুষ তার দুঃখিত মুখটাকে ঘরের কোণে রেখে আসে। আমার বোধহয় এই সাধারণ নিপুণতাও নেই। মুখোশের ভিড়ে অসহায় একটা মুখ নিয়ে বড়োই কাহিল হয়ে থাকি আমি। কিন্তু, দোহাই, 'বেচারা' বলে আমাকে গালাগালি দেবেন না। গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়ার একটা অভ্যেস আমার আছে বলেই, বলে ফেললাম কথাটা। জানবেন, আমি ঠিক আছি। আমার মতো করেই বেঁচে আছি আমি। আপনার কি মনে হচ্ছে, আমি ভুল জীবন কাটাচ্ছি? আপনি যে-জীবনটা কাটাচ্ছেন সে-সম্পর্কে আপনার মতামতটা কী? হ্যাঁ, আমি বাড়িতে ফিরছি। বেশ কিছু মানুষেরই বোধহয় নিজস্ব একটা শহর থাকে। আমার সেই ভালোবাসার শহরের ভেতর দিয়ে, এক সুগন্ধের ভেতর দিয়ে, আমি এখন বাড়ি ফিরছি। কলেজ স্ট্রিট থেকে শ্যামবাজারের দিকে একা-একাই হেঁটে চলেছি আমি। এক কাপ লেবু-চা খাব আমি শ্যামবাজারে। রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে। হয়তো সেই একা-একাই। অথবা উড়নচণ্ডী কিছু ছেলের সঙ্গে যাদের কোনো ব্যকরণ নেই। এই ঘেমে ওঠা শহরটাও চায়, তাকে পুরোটাই অনুবাদ করি আমি। ট্রামে-বাসে তো আজ আমি উঠতেই পারতাম। কিন্তু আমার ভাবনাগুলোকে নিয়ে আজ আমি একটু খেলা করতে চাইছি। আমি কবিতা লিখি, কিন্তু আমি কবি নই। হতে পারতাম কোনো খেলোয়াড়। খেলোয়াড়ই তো হতে পারতাম আমি। কিন্তু তবুও আমি কোনো খেলোয়াড়ও নই। মাস্টারমশাই হিসেবে কি আমাকে ভাবা যায়? এ-বিষয়েও এত সঙ্কোচ, একেক সময় মনে হয়, যেন মাস্টারি করতে এসেই কোনো অপরাধ করে ফেলেছি আমি। আমি নিজেই তো পড়াশুনা করতাম না ছেলেবেলায়। স্কুল পালাতাম। ছেলেবেলা থেকেই আমি নিজেকে শুধু নষ্ট হতে দিয়েছি, ভেসে যেতে দিয়েছি, উড়িয়ে-পুড়িয়ে দিতে চেয়েছি নিজেকে। দ্বিধা আর শঙ্কা, এই নিয়েই আমি এক বিতিকিচ্ছিরি আমি।—কোন্ বিছে আমাকে কামড়েছিল? কোন্ অন্ধতা, বধিরতা, আমাকে ঠেলে দিয়েছিল অস্বাভাবিকতার মাঝখানে?

২

মৃত্যুর সঙ্গে আগে ঝগড়াঝাঁটি হতো আমার, এখন আর হয় না।

বুড়িয়ে গেলাম নাকি আমি? ফ্যাকাসে হয়ে গেলাম? এই তো সেদিন দশ বছর বয়স ছিল আমার, লাফ-ঝাঁপ দিচ্ছিলাম পিসিমার বাড়িতে, আর এক মুহূর্তে একেবারে এই পঞ্চাশ!—রাশি রাশি গানের মধ্যে "মাধবীরাতে মম গীতবিতানে" কিংবা "বাঁধো না তরীখানি আমারই তরুমূলে" গানদুটো এখনও আমি

আবছাভাবে শুনতে পাই যেন। আমি এখনও দেখতে পাই আমাদের কালিঝুলি মাখা পুরোনো রান্নাঘর, আর তার ভেতরে আমার সোনালি চুলের মাকে, যিনি আস্তে আস্তে গান গাইতে গাইতে ঝিঙে-পোস্ত রান্না করছেন, অথবা ভাজা ইলিশ খুন্তি দিয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছেন আমাদের পাতে।

আমার ছিল গোপন এক ব্যক্তিগত মৃত্যুবোধ। কৈশোরের সেই কবে এক ফাঁকা দুপুরবেলায়, মনে পড়ে, যখন ঝিম-ঝিম করছিল চারপাশ, যখন চারপাশ দিয়ে শব্দহীন ভেসে যাচ্ছিল দুপুরবেলাটা, পুরোনো বাড়ির নোনাধরা দেয়াল আর অন্ধকার কুলুঙ্গি পেরিয়ে, এক মন-কেমন-করা শান্ত বাথরুম থেকে আমি শুনেছিলাম এক শবযাত্রার চিৎকারধ্বনি। সে যে কতবছর হলো ! জীবনে সেই প্রথম আমি অনুভব করেছিলাম মৃত্যু, অনুভব করেছিলাম আমার স্নায়ু দিয়েই!–সেই দুপুরবেলাটাই আমার জীবনটাকে বোধহয় তৈরি করে দিয়েছিল এক টুকরো বিষণ্ণতার ছোঁয়া দিয়ে। সেই দুপুবেলাটাই বোধহয় আমার জীবনের চমৎকার সময়টাকেও নির্মমভাবে শাসন করেছে। এত নিবিড় সব ভালোবাসা থেকে, দৃশ্য থেকে, আনন্দ থেকে আমাকেও যে একদিন বিচ্ছিন্ন হতে হবেই, এই যন্ত্রণা, বিস্ময়, সেই নির্দোষ বয়সেই কেন যে আমাকে কামড়ে ধরেছিল। আমি তো ব্যাপারটা মাকেই বলতে পারতাম সেদিন। দিদিকে বলতে পারতাম। তেমন তো মুখচোরা ছিলাম না আমি। আমি তো উড়িয়েও দিতে পারতাম ব্যাপারটাকে।–এ কেমন ব্যক্তিত্ব তৈরি হলো আমার ! ন্যাতার মতো জবজবে হয়ে গেলাম ! অনেক পরে, "একদিন মৃত্যু হবে জন্ম হয়েছে" এই সহজ সত্যি কথাটা জানার পরেও, আশ্চর্য, কেন যে আমি মৃত্যুর দাসত্ব থেকে মুক্তি পাইনি? আমাকে বইতে হয়েছে এই নগ্ন খোলামেলা মৃত্যু, বিশ বছর তিরিশ বছর চল্লিশ বছর।

অথবা সুদূর ছেলেবেলার সেই বাগবাজার। বাগবাজারের সেই গঙ্গার ধারের ভাঙাচোরা বাড়িটা। মনে আছে, মা-বাবার সঙ্গে বেরিয়ে পড়েছিলাম। সকালবেলা না বিকেলবেলায় আজ আর মনে পড়ে না। মনে পড়ে, শুধু একটামাত্র দৃশ্য। গঙ্গার দিকে মাথা করে রোগা আর ফর্সা এক ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে ছিলেন। বুকে, গীতা। ব্যস, হলদেটে সেই রক্তহীন মুখ, চল্লিশ-বিয়াল্লিশ বছর পরেও কেন ভুলতে পারলাম না আমি?–মৃত্যু ঐরকম। আসে আর বুক বাজিয়ে চলে যায়। তুমি তার সঙ্গে কীভাবে জিতবে বলে আশা করো?

৩

ভাবনা জিনিসটা বড়োই অদ্ভুত। কখন যে মাথায় এসে ঢোকে তুমি তার কিচ্ছুটি বুঝতে পারবে না। ছেলেবেলার একটা বেয়াড়া ভাবনা তোমাকে বুড়োবয়সেও জ্বালাতে পারে। ঠিক সেই সময়েই হয়তো যখন তুমি ভাবছো, পাইপটা এবার ধরলে হতো। ধূমপান বিষয়ে তুমি ভাবো অনেক। তবে প্রকাশ্যে এবার আর ধূমপান করতে পারবে না তুমি। বিশেষ একটা ঘরে, আলাদা একটা ঘরে, তোমাকে ঢুকে পড়তে হবে একা-একাই অথবা তোমার ধূমপায়ী বন্ধুদের নিয়ে। একুশ শতক এসে গেল। তুমি তার ফিসফিসানি শুনতে পাচ্ছ, হাঁকডাক শুনতে পাচ্ছ। দু'তিনশো বছর পরের মানুষেরা, এইসব শতাব্দীর মানুষদের সিগারেট খাওয়া নিয়ে হাসাহাসি করবে একদিন। বিস্মিত হবে। ন্যক্কারজনক সামান্য ভাবনাও তোমার জুলফি ধরে একদিন টান দিতে পারে তোমাকে। তোমার ভাবনাগুলি তুমি সাদা হাওয়া-বাতাসে ধুয়ে নাও। যেমন ধরো, তোমার মাকে তুমি কষ্ট দিতে ছেলেবেলায়। ভাঙচুর করতে বাড়ি। বাবাকে ভয় পেতে।পঞ্চাশ বছর পরে, খালি গায়ে, শুধুমাত্র একটা আণ্ডারওয়্যার পরে চিলেকোঠায় বসে কাউকে মনস্তাপ করা কাউকে মানায় না। বিশেষ করে

একটা ছটফটে মেয়ে যখন তোমাকে আজ ঘিরে আছে সারাক্ষণ। তুমি মেয়েকে নিয়ে জানলায় বসে থাক আজকাল। আজকাল তুমি আর গানই গাও না! কেন বল তো? তুমি সুর ভুলে গেছ নাকি? কথারা হারিয়ে যাচ্ছে? চোদ্দপনেরো বছর আগে তোমার গলা ছিল চমৎকার। আর সারা বাড়িতে তুমি ছড়িয়ে দিতে পারতে গান।–বেদম ক্রোধের স্মৃতি বড়ই বেদনাবহ। তুমি বাবাকে রাগিয়ে দিয়েছিলে। লম্বা একটা ছড়ি হাতে তোমার বাবা উঠে এসেছিল দোতলায়। আলোর একটা রেখার মতো তুমি ছিটকে সরে গিয়েছিলে দূরে। একরাশ অন্ধকার তোমাকে গিলে ফেলেছিল।–আচ্ছা, আবছা স্মৃতিগুলোকে নিয়ে এবারে তুমি কী করবে? অবশ্য, সবকিছুই তুমি ভুলে যাচ্ছ আস্তে আস্তে। বছর বারো-তেরো আগেই তোমার ডাক্তারবাবু বলেছিলেন তোমাকে, "কিছু কিছু জিনিস তুমি ভুলে যাবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা কোরো না যেন।"–কিন্তু এই ভয়াবহ বিস্মৃতি ! যে দু-একটা বই তুমি ভালোবেসে জেনেছিলে একদিন, যে দু-একটা নাম,মুখ তুমি ভালোবেসে রেখে দিয়েছিলে জীবনে–ভুলেই তো যাচ্ছ সেসব। তাহলে?–তুমি খেয়াল রাখো এবার মেঘের দিন আর নীল আকাশের দিন–দেখো তো, মেঘগুলোকে কি ছেলেবেলার সিগারেট প্যাকেটের রাংতার মতো মনে হচ্ছে না?

৪

ডাক্তারবাবু গাড়ি থেকে নেমে এক অন্ধকার আধো-পরিষ্কার ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললেন, "এবার কম জিনিস নিয়ে বেঁচে থাকো।"

–আশ্চর্য, এ কথার মানে কী? আমার কি চাওয়ার ছিল হাজার-কোটি জিনিস! আর আমি সেসব কি জানতামই না কিছু! নাকি যা হয়ে গেল, সেটা শান্তভাবে আমাকে মেনে নিতে বলছেন ডাক্তারবাবু। না, এখন বেশি উত্তেজনা বোধহয় ভালো নয়, বেশি কথা ভালো নয়, এখন থেকে দেখা আর শুধু অনুভব করা–আর যদি সম্ভব হয়, লিখে রাখা দু'-চার লাইন–স্বর্গের কথা নয়, নরকের কথা নয়, শুধু এই পৃথিবীটার কথা যেখানে গাছেরা দু-তিনপা হাঁটতে পারলে হয়তো বলে উঠতো, "আঃ, বেঁচে গেলাম।"

ডাক্তারবাবুকে মাঝে-মধ্যে বাবার মতো মনে হয়। আর আজকের সকালবেলায় তার গলার স্বর কেমন যেন মা'-র স্নেহ ! এই স্নেহও যদি আন্তরিক না হয়, সে এক তাজ্জব ব্যাপার হবে। কিন্তু কোথায় আছি আমি ? কলকাতায়? শিলিগুড়িতে? কিছু আগে, কে যেন আমার সঙ্গে হাঁড়িচাচা গলায় কথা বলছিল। ঘোর কাটতেই, প্রথম যে কথাটা আমি বলতে পেরেছিলাম, "আমার চশমা?" চশমা পরতে পরতেই আমার নজরে এসেছিল তুখোড় এক কম বয়সের ছোকরা আমাকে চশমা পরিয়ে দিচ্ছে, যে হয়তো-বা আমার ছাত্র–কিন্তু ছাত্র তো নয়– এ এক দোতলা বাড়ির জালে-ঘেরা বারান্দা, বেঞ্চিপাতা, যেখানে অদ্ভুত কয়েকজন মানুষ ব'সে...... যে বা পাথরে-গড়া, দুঃস্বপ্নের ভাষা সমেত চিরনির্বাসিত কয়েকটা মুখ...। যাক, কাল রাতে আমি তাহলে মদ্যপানবশত কোনো ফুটপাথে শুয়ে থাকিনি, আমার চশমা চুরি যায়নি, হাতঘড়ি চুরি যায়নি, যদিও পকেট একেবারেই ফাঁকা– পকেটই তো আমার চিরকালের ব্যাঙ্ক– একশো টাকার নোট দু-তিনটে কি ছিল তাহলে? তাহলে কি এবারও ফর্সা হলো সেসব !

৫

নতুন ধরনের একটা স্বপ্ন দেখে যারপরনাই আজ খুশি হয়ে আছি আমি।

আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, ঘটনা নেই এমন একটা টানা গদ্য লিখে ফেলেছি আমি। ৫৩২ পাতার। আমাদের তরুণ এক কবি, কোথা থেকে যেন, হাঁসের মতো গলাটা লম্বা করে বলে উঠলঃ হতেই পারে না। এ সম্ভব নয়। অসম্ভব। তারপর কী যে হলো স্বপ্নটা !

আড্ডা যে আমার ভালো লাগে–সে তো আমি আগেই জানিয়েছি। বেঁচে থাকতে হবে। মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকতে হবে। সুখী হওয়ার সাহস নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

বাস্তবিক, আমি হচ্ছি সেই ধরণের লেখক, একটা কি দুটো পাতা লেখার পরই যে-কিনা ভাবতে থাকে, গোটা একটা উপন্যাসই লিখে ফেলেছে সে। অনেক হয়েছে এবার। যথেষ্ট।

হাওয়া বইছে আজ দুপুরবেলায়। আর সরু গলায়, কোনো বাড়ির ছাত থেকে কোনো বাচ্চা মেয়ে এখন চেঁচাচ্ছেঃ মামু, খেতে এসো । ভাত দিয়েছে।

আজকে অনেক বেশি সিগারেট হলো। এতটা ভালো নয়।

৬

পৃথিবীর সব পথই, একেকদিন মনে হয়, তাসের টেবিলের দিকে চলে গেছে। বিশেষত শনিবার অথবা রবিবার সূর্য ডুবলেই হাঁসফাস করে ওঠে কিছু মানুষ। শীত চলে যায়, গ্রীষ্ম চলে যায়, –মাস, বছর চলে যায় গড়াতে গড়াতে। একদিন ফুরফুরে হাওয়া বইতে থাকে বাইরে। বৃষ্টি আসে। দূরে রাস্তায় মহিলাদের হাসির শব্দ ভাসতে থাকে কখনো, গাছের শুকনো পাতাগুলো উড়তে থাকে বাতাসে। শুধু কিছু লোকের হাতে সারাবছর থেকে যায় সেই হরতন, রুইতন–সারাবছর বাটা হতে থাকে তাস–আর ঘরের মধ্যে ঝিমিয়ে পড়ে কেউ, কেউ হঠাৎই চাঙ্গা হয়ে ওঠে। বর্মনদের তাস খেলা সুভাষগ্রামের মানিক চক্রবর্তী মেনে নিয়েছিলেন। এ-বিষয়ে সুন্দর একটা কবিতাও লিখেছিলেন তিনি। আমি ছেলেবেলায় বিস্মিত হয়ে একেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবার তাস খেলা দেখতাম। বিশেষত, তাসের সাফলিং। তাস সাফলের সময় মনে হতো, বাবার দু'হাতে হাওড়া ব্রিজটি যেন গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ছে, আর কী আশ্চর্য, পরমুহূর্তেই সুন্দরভাবে জেগে উঠে শুয়ে পড়ছে আবার। বাড়িতে কেউ ডাকতে এলেই, মা আমাকে অথবা দিদিদের কাউকে পাঠিয়ে দিতেন দত্ত বাড়ি থেকে বাবাকে ডেকে আনতে। এলাহি একটা ব্যাপার চলত সেখানে। কতরকমের যে হাড়ের নস্যির ডিবে, কত রকমের যে সিগারেটের প্যাকেট পড়ে থাকত টেবিলে, সে এক কাণ্ড।

ফাঁকা প্রহর যখন ঝমঝমিয়ে ওঠে। সেসব সময়, আমিও আজকাল ঢুকে পড়ি তাসের আড্ডায়। নতুন নতুন ক্যালেন্ডার আসে বাড়িতে। আর আমি, তাস দেখি। তাসুড়েদেরও দেখতে থাকি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। তাসের থেকে তাসুড়েরা বিন্দুমাত্র কম নয় কিছু। শীতের রাতে আগাগোড়া চাদরমুড়ি দিয়ে কেউ কেউ এসে ঢোকে এই ঘরে, কেউ ঢোকে বাবুর পোশাকে। চা আসে, বিস্কুট আসে। পান আসে কখনো-বা। উত্তেজনায় ভর্তি হয়ে ওঠে ঘর। কিন্তু, বাইরে কি উত্তেজনা কম ছিল? এই সাহেব এই বিবি আর গোলাম বড়ো বেশি জ্যান্ত হয়ে ওঠে এই ঘরে। হাতের মুঠোয় কাঁপতে থাকে জীবন। কোলাহল শুরু হয়ে যায়।

তাসের আড্ডায় বসে থাকতে থাকতে আমি দেখেছি সময় কিরকম ঈগল পাখির ডানার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। ঐসব আচ্ছন্ন মানুষ যারা স্বপ্নের মধ্যেও কথা বলে আমি দেখেছি তাদের। শুধু অফিস-যাওয়া আর ফিরে আসা। আর ডাঁটা-চচ্চড়ি। আর ঘুম। আর তাস। একটা অলসযানে জীবন কাটিয়ে দেওয়া যেন।

বাহান্নটা তাস যদি আমার জীবনটাকেও ওইরকম পাল্টে দিতে পারত, আমার দুঃখ থাকত না কোনো। সেদিন হলো কি, আমি ফিরছিলাম বাড়িতে। সঙ্গে ছিল এক তাসুড়ে, যে শুধুই তাস নিয়ে বকবক বকবক করছিল। একটু রাত তো হয়েইছিল। পথঘাট ছিল নির্জন ও আনন্দদায়ক। চাঁদটাও ছিল বোধহয় পূর্ণিমার। চাঁদ সম্পর্কে সত্যিই আমার তেমন কোনো আদিখ্যেতা ছিল না কোনোকালেই। কিন্তু সেদিন , ঐ রাতে, আমার বন্ধু কী বলে চলেছিল আমার খেয়াল ছিল না। আমি শুধু বুঝতে পারছিলাম, বিস্ময়কর এক অনুভূতি জেগে উঠছে আমার মধ্যে। এমন এক অনুভূতি, সারাজীবনে মাথা খুঁড়েও যার এক মুহূর্তের জন্যও দেখা পাইনি আমি। প্রায় ঘুমন্ত রাস্তায় সেদিন চাঁদের টুকরো, জ্যোৎস্না, নিঃশব্দে ঝরে ঝরে পড়ছিল আমার শরীরে, চেতনায়, আমার জীবনে। জ্যোৎস্না যেন-বা ভিজিয়ে দিচ্ছিল আমাকে। আমি কি রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম দেড়-দু'মিনিট? হতেও পারে। এ কী উজ্জ্বলতা! এ কী উদ্ভাসন! জীবন যেন কাছে এসে বলছে আমাকেঃ বেঁচে থাকো বাপু, দ্যাখো, জীবন কী রহস্যময়, কী অবিশ্বাস্য রকমের আনন্দের।

৭

পাশের বাড়ির রান্নাঘর থেকে ভোররাতে কেউ একটা ডেকচি চুরি করে নিয়ে গেছে। কে নিয়েছে? আজ সকাল থেকেই তুমুল হৈ-হল্লা তার জন্যে। খিস্তি-খেউড়। সত্যিই তো, এ আবার কী ! বাড়ির বৌ-টি কথায় কথায় ঠাকুরপো ঠাকুরঝির মা-বাপের শ্রাদ্ধ করছেন। তার স্বামী-দেবতাটি পাজামা আর গেঞ্জি পরে, উত্তেজিত, পায়চারি করছেন ঘরময়। শুধুই দিনের পর রাত, আর রাতের পর দিন, স্বপ্নহীন, আরেকরকম এই হাড্ডাহাড্ডি এই টিঁকে থাকা। অনবরত যে চুলো একটা জ্বলে যায়, তাকে নিয়মিত একটা মশলা যোগানো। এইসবের গভীরে আমি বোধহয় ঢুকতে পারিনি কোনোদিন। চাওয়ার বলতে তো ছিল শান্ত একটা হাত, মুখ একটা; সেও এই জাদুকরী সময়ে কত বেশি চাওয়া, কত বেশি আহ্লাদের।

চেঁচামেচিকে একটু পাশে সরিয়ে, আমি ভাবছিলাম তোমাদের বাড়ির দিকে আজ আস্তে আস্তে এগোনো যেতে পারে। খুবই শান্ত পায়ে তোমার কাছে গিয়ে বসে থাকা যায় আজ। কথা হয়তো সামান্যই হবে আমাদের। তোমাকে একটা সুন্দর কাঠবিড়ালীর মতো মনে হতো আমার। সেসব কথা বলতে বলতে, ভুলতে ভুলতে, নতুন ভাষার জন্যে তোমাদের তিনতলার বারান্দা থেকে ঝুঁকে হয়তো দেখেও ফেলতে পারি সেই চব্বিশ বছর সেই পঁচিশ বছর আগেকার আমার দিনগুলো ঠিক কোন রঙের ছিল, কেমন দেখতে ছিল তাদের, কেমনই-বা গন্ধ ছিল সেইসব দিনগুলোর।

মুখ ফিরিয়ে যখনই দেখি, দেখি এক স্থির, নিস্তব্ধ, কুয়াশাঘেরা বাল্যকাল যেখানে সহজেই সাঁতার দেওয়া যায়। যদিও বিস্মৃতির এক ঢল নামছে জীবনে, কুয়াশার মায়াজালে আমি এখনো দেখতে পাই এক কিশোরের স্বপ্ন আর তার সমাধি, অবাধ্যতা, আর নষ্টামি চারপাশে ছড়িয়ে রয়েছে। ভুল দিক থেকে এসে পৌঁছনো, একঘেয়ে আর ক্লান্তিকর জীবনের সেই নিরীহ কিশোরকে, সেই তরুণকে আমি বাঁচিয়ে তুলেছিলাম। তাকে বেঁচে থাকতে শিখিয়েছিলাম। তার দু'চোখে এঁকে দিয়েছিলাম রূপ, সৌন্দর্য আর ভালোবাসা। স্বাভাবিকতাই সৌন্দর্য, এ-কথা আমি কতবার যে আউড়েছি তাকে।—তুমি তো চিনতে সেই ঘামে-ভর্তি কিশোরকে, সেই বাউণ্ডুলে তরুণকে, যাকে তুমি কাছে পেতে কোনোদিনই তেমন সাহস পাওনি। কিন্তু আমিই-বা কেন তোমার দিকে বার-বার আজও যেতে চাই এমন !

জীবন এইরকম বলে আমি চলাফেরায় শুধুই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম একসময়। চড়ুইদের কাছ

থেকে শিখতে চেয়েছিলাম কীভাবে বেঁচে থাকতে হয় জীবনে। বড়ো বেশি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল জীবন, বড়ো বেশি নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল সবকিছু। এই চেল্লামেল্লি, দারিদ্র্য, এই নিষ্ঠুরতার মধ্যে আমিও শেষ পর্যন্ত জুতে দিয়েছি নিজেকে। চালিয়ে দিচ্ছি দিনগুলো। আমার জীবনের প্রতিটি চেষ্টাই বোধহয় মৃত্যু থেকে শুধু জীবনের দিকে যাওয়ার। চেয়েছিলাম কিছু-একটা করি। আরো দ্রুত। বেলা বড়ো তাড়াতাড়ি সরে যায় এখানে। দেখতে না দেখতেই।

নীল আকাশ থেকে সাদা পরীরা বিরামহীন আজ নেমে আসছে রাত্রিবেলা, আর ফিসফিসিয়ে আমাকে বলছেঃ "এসো, আমাদের সঙ্গে এসো"। কেন যে আমি মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছি তাদের মুখ থেকে, কেন যে বলছিঃ "না"! এই আকাশ-বাতাস, এই পৃথিবীটাকে জীবনটাকে কি আমার আরো একটু ভালো লেগে গেল তাহলে?

৮

"আশ্বিনে রাঁধে কার্তিকে খায়" এমন একটা সুন্দর কথা ছেলেবেলায় শুনতাম মা'র কাছ থেকে। আশ্বিনের শেষ রাতে, সরু চালের ভাত, জল দিয়ে রেখে দেওয়া হতো হাঁড়িতে। আর কার্তিকের প্রথম দিনে—রান্না হতো না বাড়িতে—নারকেলের কুচি দিয়ে খাওয়া হতো সেই ভাত।—আজ নির্জনতা থেকে তাকিয়ে দেখি সেই নিরীহ সুন্দর দিনটাকে। শুনতে পাই, আমি জন্মেছিলাম এই দিনেই। কার্তিকের প্রথম তারিখে, ভোররাতে, কলকাতার দর্জিপাড়ায়। কিন্তু ১৬ ফেব্রুয়ারি তো কার্তিকের প্রথম দিন নয়! ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ কি ঠিক আছে ? একটু পিছিয়ে গিয়েও এসব জানার কোনো উপায়ই হয়তো নেই আর।

ছেলেবেলার স্মৃতি বলতে আমার মনে পড়ে, মা'র কোলে শুয়ে আছি, আর দূরে ভীষণ শব্দ হচ্ছে কোথাও। অনেক বড়ো হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম, সেসব ছিল দিক-কাঁপানো ভয়াবহ সব বোমার শব্দ। আরেকদিনের কথা মনে পড়ে। দিদিরা দাঁড়িয়ে ছিল ঘরের জানলায়, আর সেই জানলায় উঠতে দেওয়া হচ্ছিল না আমাকে। তবুও, কোনোরকমে উঁকি দিয়ে আমি দেখেছিলাম এক অদ্ভুত ঠেলাগাড়ি। বালি-সুরকির ছবিটা ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু এইটুকু মনে আছে, সেই গাড়িতে ভর্তি ছিল দুটো-তিনটে রক্তাক্ত মৃতদেহ। আর গাড়িটা গড়িয়ে যাচ্ছিল পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গার দিকে।

ছেলেবেলা থেকেই আমি গল্পের বই পড়তাম দেদার। তেমন কোনো বাছবিচার ছিল না বইয়ের। মা-বাবা-দিদিদের সঙ্গে থাকতে থাকতেও তীব্রভাবে কিছু একটা চাইতাম। বেরিয়ে পড়তে চাইতাম রাস্তায়। হয়তো উচ্ছন্নে যেতে চাইতাম। ঐসব দিনে, মৃত্যু তার যাবতীয় রহস্যময়তাকে যেন খুলে দেখতে বলত আমাকে। একটা ভুষোকালিমাখা কাঁচ দিয়ে আমি দেখেও ছিলাম কিছুটা, আর তার জন্যে আমাকে বেশ কিছু বছর বইতেও হয়েছিল এক বেদনাবোধ, প্রায় একটা আচ্ছন্নতার মতোই।

নিলীয়মান শব্দটার ভেতরে একটা ট্র্যাজেডি আছে।

আমাদের অমল ও দুর্গার মৃত্যু, আমি বুঝতে পারি, আমাকে অনেকটাই ছুঁয়ে রয়েছে। ছেলেবেলায় আমি ছিলাম অমলের মতোই এক জানলা-পাগল ছেলে। আর অপু নামে কিশোর তো আমাদের প্রত্যেক বাড়িতেই রয়েছে।—আর দুর্গা? মনে হয়, আমি কতদিন ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছি। দুর্গা কি কখনো

মারা যেতে পারে? মারা গিয়েও এমন জ্যান্ত মেয়ের সঙ্গে আমার আর পরিচয় হয়নি কোনোদিনই।

ক্ষ্যাপাটে হয়ে যাচ্ছি নাকি? তালকানা হয়ে যাচ্ছি? শুধুই মনে হচ্ছে কত হাজার-লক্ষ-কোটি বছরের পর আমাদের হঠাৎ এই মানুষজন্ম ! উনি আমার মা ছিলেন, তিনি বাবা ! এই ভাই, বোন, দিদিরা ! এই দু'একজন বন্ধু! তারপর শুধুই মিলিয়ে যাওয়া। আবার হাজার-হাজার কোটি বছরেও দেখা হবে না কারো সঙ্গে ! এই রহস্য মাঝে-মধ্যেই বড়ো আনমনা করে তোলে আমাকে।

আমাদের বিদঘুটে গলিতে আমি আজ যে বিনীত এক শবযাত্রা দেখলাম তা শুধুই মনটাকে মেঘলা করে দিচ্ছে। সাত-আট বছরের এক চির-ঘুমন্ত ছেলে।–কাদের? কোনবাড়ির? মুখে চন্দনের ফোঁটা। সারা খাট জুড়ে শুধু রঙিন বেলুন, প্লাষ্টিকের লাল ঘোড়া। চারজন শান্ত যুবক খাটটা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যেন প্রাচীন মিশরে সহসাই আমি ঢুকে পড়েছি, আর মুহূর্তটা দু'হাজার-তিনহাজার বছর থমকে দাঁড়িয়ে আছে!

শুধু একটা খালি চেয়ার আমি রেখে দিয়েছি আমার ফাঁকা ঘরে। হয়তো কোনোদিন তিনি এসে বসবেন এই চেয়ারে। পাশে যে টেবিল, সেই টেবিলে ছড়ানো রয়েছে কয়েকখানা বই। একটা ফাঁকা গেলাস যেখানে জল দেওয়া হবে তাঁকে। আছে মোমবাতি আর হাতপাখা, যদি তিনি বসেন কিছুক্ষণ, শুধু তার জন্যে।

কিন্তু তিনি কি বসবেন? প্রায়ই ভাবি কেমন দেখতে তাঁকে? কেমন তাঁর মুখের চেহারা, কেমন তাঁর পোশাক। সরবত খান না কি তিনি? তর্ক কি চলবে তাঁর সঙ্গে? চলবে না? সিগারেট খাওয়া যাবে একটা?

৯

আমি ঠিক আমার মতোই। আমার থেকে আমি একটু ভালোও নই, একটু খারাপও নই। মহান হতে চাওয়ার একটা ধান্দা শুধু মাঝে-মধ্যে আমাকে পেয়ে বসে। আমার এই গোলমেলে ইচ্ছেটাকে এবার একটু ছেঁটে দিতে হবে। আমি সত্যিই একটা নিরুপদ্রব পৃথিবীর কথা ভেবেছিলাম, স্বপ্ন দেখেছিলাম একদিন, আর আরো একটু ঝুঁকে পড়েছিলাম কাগজ-কলমের দিকে! হিংসা আর প্রতিহিংসা যেখানে প্রতিমুহূর্তেই নাচ দেখায়, সেখানে সেই ছুঁচের ডগায় দাঁড়িয়ে এর থেকে মূর্খতা আর কী হতে পারে? কিন্তু সত্যিই কী এটা মূর্খতা? কে জানে!

কোথায় ছুটছেন? দৌড়চ্ছেন কোথায়? দাঁড়ান তো এক মিনিট। চারপাশের মানুষজনদের দিকে তাকিয়ে এরকমই সব হাজার কথা ভেসে ওঠে আমার মনে। কী করুণ এই দৌড়, এই দৌড়োতে থাকা! মুহূর্তের জন্যেও চারপাশটা একবার তাকিয়ে দেখার কোনো অবসরই আর নেই মানুষের। বাড়ির বারান্দার যে জায়গাটায় গুটিগুটি ব্যাঙ্ক এসে হাজির হয়েছে, মনে হচ্ছে আমাদের নিশ্বাসগুলোও একদিন ব্যাঙ্কের লকারে চাবি দিয়ে রেখে দেবেন কেউ ! হাসিঠাট্টাগুলো সব গেল কোথায়? কী গম্ভীর হয়ে গেছেন আপনারা! দেখুন তো একবার নিজেদের দিকে তাকিয়ে।

চৈত্র মাস চলছে। একা একা ঘুরছিলাম রাস্তায়। অনিশ্চয়তার এক ভূত কোথা থেকে এসে, ঘাড় ধরে আমাকে আজ বিকেলবেলা নিয়ে চলল কফি হাউসে। কিন্তু কবিরা সব গেলেন কোথায় আজ! কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না! জানলার কাঁচ থেকে একটুকরো আলো এসে ফিঙে পাখির মতো নাচছে দেয়ালে। কিন্তু আজ গেলেন কোথায় সব! টেবিলে না বসে আজ সারা সন্ধ্যেবেলা দাঁড়িয়ে থাকব নাকি বাবা কফি হাউসের মধ্যিখানে ! কফি হাউসের কোনার দিকের টেবিলের একটি মেয়ে কোথা থেকে একটা চিরুনি বার করে চুল

আঁচড়াচ্ছিল। মুখোমুখি বসে থাকা ছেলেটি কি তার আয়না? ঠিকমতো ফুটে উঠছ তো মেয়ে? প্রকাশিত হতে থাকো। আমি কি তোমার আয়না হতে পারতাম না ভাবছ?

কফিতে চুমুক দিতেই রাশি রাশিভাবনা এসে ছেঁকে ধরল আমাকে। প্রায়ই ভাবি 'দেখে নেবো' গোছের একটা বিশাল গদ্য লিখতে থাকব আমি। একটা কঙ্কাল থাকবে তার প্রধান চরিত্রে, অবশ্য তার ডায়ালগ থাকবে না কোনো। জুতসই প্রথম লাইনটার জন্যেই শুধু যা আমি অপেক্ষা করছি এখন। দু'তিন সপ্তাহের মধ্যেই, আমার মনে হয়, তা নিশ্চয় পেয়ে যাব। এই তো সেদিন নাভ্রাতিলোভাও একটা আস্ত উপন্যাস লিখে ফেললেন—আর গঙ্গারাম, তুমি ঘটনাহীন টানা একটা গদ্য লিখতে পারবে না? ঘরে বসে, পাইপ টানতে টানতে আর কতদিন চালাবে তুমি? শীতের সময়, যা কিনা আমাদের কালচারের সময়, তুমি সেই সময় বাড়িতে শুয়ে শুয়ে শুধু ঘুমোও নাকি হাঁদা?

আমার বরাবরের একটা দোষ এই যে, আমি সময়টাকে চলে যেতে দিই। নষ্ট করি। তার পর তার জন্যে বিপুলভাবে মনস্তাপ করি শুধুই। এই গদ্যটা এবার অবশ্যই লিখে ফেলব আমি। প্রথম লাইনটা যেভাবে হোক, পেতেই হবে আমাকে। এমনই একটা লাইন খুঁজছি আমি যা পরবর্তীকালে নিঃশব্দে আমাদের ভাষার বাগ্‌ধারাতেও চলে যাবে।—তুমি যখন কিছুই করো না তখন তুমি কী করো সুমন্ত?—'নাঃ' আমি এরকম লাইন খুঁজছি না। বড়ো ফাঁকা বুলি হয়ে যাচ্ছে। চালাকি হয়ে যাচ্ছে। শুধুই ভাষার কেরদানি। চমক।

কিন্তু যদি এরকম ভাবে শুরু করা যায়ঃ আমি কফি হাউসে বিশ্বাস করি। দীপশিখায় বিশ্বাস করি। লোহা আর পাথরের ফাঁকে যে চিরকালীনতা তার সবুজ আর দীপ্তিতে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি কবিতায়, ভালোবাসায় বিশ্বাস করি।

নাঃ, এটাও খারিজ করতে হচ্ছে। কোনো বক্তৃতা দিতে চাইছি নাকি আমি? কী গণ্ডগোল!

১০

কোনো এক কবির লেখায় পড়েছিলামঃ জীবনে একটা ভুল মানেই হাজার বছর বরফের ওপর হেঁটে বেড়ানো। আমি তো ভুলে-ভর্তি একজন মানুষ। কত হাজার বছর আমাকে হেঁটে বেড়াতে হবে বরফের ওপর?

একসময় আমার সন্দেহই হয়েছিল যে, বেঁচে আছি কিনা! আর বেঁচেই যদি থাকি তো আরোকিছু বছর আমি বেঁচে থাকতে চাই না? সেরকমই যদি হয়, বেঁচে থাকতেই চাই যদি, তাহলে বিন্দুমাত্র টাকাপয়সা জমালাম না কেন? কেন হেসে উড়িয়ে দিলাম সঞ্চয়ের কথাটা?

এমন কি কোনো রোজগেরে মানুষ দেখা যায় যিনি ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য কোনোরকম টাকাপয়সা জমান না? আজকাল একেকসময় কেঁপে উঠি, বলতে ইচ্ছে হয়ঃ দেখা যায়। মশাই, এই তো দেখুন না আমাকে। আমার এক সহকর্মী একবার আমামকে বলেছিলেনঃ লোহার দরকার না হলেও, তুমি বাপু লোহা কিনে ফেলবে।—কথাটা তো সত্যিই। রঙবেরঙের সব শার্ট কিনতাম। সুন্দর সব শার্ট। ইচ্ছে অবশ্য একটা ছিল। ইচ্ছে ছিল, রঙিন জামাকাপড়ের আড়ালে ছেঁড়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখটাকে লুকিয়ে রাখার।—কিন্তু আমি সাফাই গাইছি না তো?—হ্যাঁ, তোমার ওসব ছেঁদো কথায় মনস্তত্ব ভুলবে না। 'ওহে', বলতে পারে মনস্তত্বঃ 'চরিত্রহীনতার লক্ষণ এসব।' সে তো জীবনানন্দেরও “কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের” ভেতরেও মনস্তত্ব খুঁজে পেতে পারে চরিত্রহীনতা। আর এত মনস্তত্বের কথাই বা কেন? আমি

কি মনস্তত্ব পেরিয়ে আরো কিছুটা দূরে হেঁটে যেতে চাই না? আমি সমকালীনতা পেরিয়ে চিরকালীনতাকেও একটু ছুঁয়ে দিতে চাই না?

একজন মানুষ আর একজন মানুষের ক্ষতিসন্ধান করছেন তেমন মানুষের দিকেই আমার ভুরু কুঁচকে তাকাতে ইচ্ছে করে। আমার তো মনে হয় এই অপচিকীর্ষাই চরিত্রহীনতা। চরিত্র সম্পর্কে আমার তো এমন গেল গেল ভাব নেই। আমার এক মাস্টারমশাই, রুদ্রদা, মহিলারা যাকে প্রভূত ভালোবাসতেন, একবার বলেছিলেন আমাকেঃ চরিত্র হচ্ছে সেই জিনিস যা আমার নেই।–আরেব্বাস্। কথাটা শুনে অল্পবয়সে আমার তাক লেগে গিয়েছিল। সেই ঘোর এখনও বোধহয় কাটানো গেল না।

ভুল আমার জীবনের প্রত্যেকটা ব্যাপারেই ছড়িয়ে আছে। কেন আমি আমার দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখটা লূকোতে চাইতাম? উন্মাদ হয়ে যাচ্ছি, এই ছবিটা আমার মুখে লোকেরা ফুটে উঠতে দেখলেই বা কী এসে যেত? আর সুন্দর জামায় মানুষের মুখ কি সত্যিই পালটানো যায়? এ কী মূর্খতা আমাকে পেয়ে বসেছিল! আচ্ছা, অমিতব্যয়িতার মধ্যে কোনোরকম যৌন আনন্দ আছে কি? আমার ভেতরকার চিন্তাভাবনার মধ্যে কি কোনো বিশাল রকমের স্বেচ্ছাচারিতা লুকিয়ে আছে? অসততা লুকিয়ে আছে কোনো? আমিও কি তবে, নিজের মনে, অজান্তে, দিনের পর দিন, একটা সাইকোপ্যাথ সমাজ তৈরি করতে করতে চলেছি? কারচুপি আর কেরামতি ছাড়া আমাদের থেকে আর কীই-বা শিখছে আমাদের ছেলেমেয়েরা?

কথায় কথায়, কাল রাতের স্বপ্নের কথাটাই আমি ভুলতে বসেছিলাম। কী ভয়াবহ একটা দৃশ্য দেখলাম কাল রাত্তিরে। একটা গোরু, দেখলাম, পেট থেকে মাথা পর্যন্ত, আস্তে আস্তে ঘোড়া হয়ে গেল। তারপর, পেছনের দু'পায়ে ভর করে দাঁড়িয়ে সে, আস্তে আস্তে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা আমাকে, মাথার দিক থেকে খেতে শুরু করল। আশ্চর্য, সেই অর্ধেক গোরু আর অর্ধেক ঘোড়াটা খেতে শুরু করল আমাকে– তারপর পুরোপুরি আমাকে খেয়ে ফেলল !

১১

জীবনকে এত প্রবলভাবে ভালোবাসি বলেই কি মৃত্যু এসে বারবার ধাক্কা দিয়ে যায় আমাদের?

নতুন একটা ব্লেড দিয়ে হাতের শিরাটাকে কাটতে চেয়েছিল আমাদের তরুণ কবি। আর শিরাটাকে বেশ কিছুটা কাটার পর, শুয়ে শুয়ে চার নং সিগারেট ধরাবার সময় একটু কাহিল হয়ে পড়েছিল সে। ব্যাপারটায় যতটা নির্মমতার ছোঁয়া আছে, তার থেকেও বেশি ছোঁয়া আছে হয়তো অপ্রকাশিত কোনো দুঃখ-বেদনার, কোনো হিমজটিল সমস্যার। আমরা যাকে হৃদয় বলি, তাকে হয়তো একটু বেশি বাইরে এনে ফেলেছিল সে, আর বেকায়দায় পড়েছিল, সেখানেই হয়তো ছোঁয়া পেয়েছিল সে কোনো অপ্রতিরোধ্য অবসাদের, আর মুখোমুখি হতে চেয়েছিল মৃত্যুর।

খুব একটা কথা বলে না আমাদের এই কবি। লেখালেখি , আমার মনে হয় খুব সুন্দরভাবেই শুরু করেছে। কোনো আত্মজীবনী রচনার জন্য ছটফট করছে না তো সে? ভ্যান গগের ছবির থেকে ভ্যান গগের কানকাটার ঘটনাটা একটু বেশি টান দিল কি তাকে? মৃত্যুর পরে কোনো অবিনশ্বর মঠ উঠবে তার চিতায়, এইরকম কোনো ভাবনায় ডানা ঝাপটাচ্ছে না তো সে? সেরকম তো মনে হয় না তাকে। আমি দুঃখ পাচ্ছিলাম এই ভেবে, জীবনটা কেন শেষ করতে চাইছিল সে! জীবনটা খুব দামি ভাবলে, মৃত্যু বিশালতর হয়ে, হাজার মুখোশে, আমাদের ভয় দেখায়। খুব সস্তা ভাবলেও রাস্তার কুকুর এসে জীবনটাকে মুহূর্তেই

গিলে ফেলে। দুঃখটাকে সামাল দিতে দিতে, জীবনের সুন্দর সময়টাকে শুরু করছে কবি, আমি এইরকম ভাবছিলাম। ভেবে আনন্দও পাচ্ছিলাম। কিন্তু, কী যে হোলো! কোথা থেকে এল এই বজ্জাত আত্মঘাতী ভাবনা? জীবনের প্রথম ভালোবাসাটা রূপকথার মতোই বিস্ময়কর। সেই ভালোবাসার ডানা কি এতটাই প্রবলভাবে ধাক্কা দিল তাকে যে, তার আর কোনোদিন কবিতা লেখার কথাটাই মনে পড়বে না? এই আত্মনষ্টতাই চূড়ান্ত সমাধান মনে হবে তার! মৃত্যুর চেয়েও যে জীবন আরো রহস্যময়, এই সহজ সুন্দর কথাটা বুঝবে না সে? তাহলে নতুন আর কী-বা হোলো? এ তো আমাদেরই সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি। সেই মৃত্যুটান! সেই পুরোনো প্রাচীন মায়াজাল!

কী এমন জীবন আমিই বা কাটিয়েছিলাম ওই উনিশ-কুড়ি বছর বয়সে? কত যে ভুল দিয়ে তৈরি আমার জীবন! ঐ ভুলের যে কোনো সামান্য একখানা ভুলই তো আমাকে যে-কোনো মুহূর্তে পুরোটাই কাত করে দিতে পারত, ডুবিয়ে ছাড়ত আমাকে। ছেলেবেলায় গোপালের থেকে রাখালের সঙ্গেই আমার পাহাড়প্রমাণ মিল ছিল। স্কুল আসা-যাওয়ার পথে কে আর রাখালের মতো এমন খেলাধূলা করেছে আমি ছাড়া? মাস্টারমশাইদের লিকলিকে বেত আমাকে পড়াশুনা থেকে অল্প বয়সেই অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। আর আমার সঙ্গে এসে জুটেছিল এক বদমাইশি আর ছ্যাঁচড়ামি। আমি প্রায় আমার সর্বনাশ করছিলাম। সপ্তাহদুয়েক জড়িয়ে থাকার পর, ষোলো-সতেরো বছর বয়সে, সত্যি কথাটা এই, আমি গাঁজা খাওয়াটাকে পুরোপুরি ছেড়ে দিয়েছিলাম। ঐ ভয়াবহ কৈশোর আমাকে খতম করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল।কিন্তু, আমি ভালোবেসেছিলাম কবিতাকে।

এই যে জীবনটা আমি ইচ্ছে মতো বেছে নিয়েছিলাম আর ইচ্ছেমতো খরচও করেছি আমিই। প্রেমের ছোঁয়া আমি কি পাইনি জীবনে? জীবনের প্রথম প্রেম আর প্রথম প্রেমেই কী প্রবল ব্যর্থতা। ধারাবাহিক প্রেম আর ধারাবাহিক ব্যর্থতা! ছিলাম একটু লাজুক আর ভীরু। যে চার-পাঁচজন বান্ধবীর সঙ্গ পেয়েছিলাম জীবনে, তার থেকে অনেক বেশি বান্ধবীদের সঙ্গে আমি মিশতেই পারিনি। তবুও, কুড়ি-বাইশ বছর ধরেও একটি মেয়ের মুখ, তার কথা, হাসি, চাহনি, ভোলা গেল না তো!—কোথায় তারা গেল সব? কেউ এসে বলছে না তোঃ "দেখো, আমি তোমার উনিশ বছরের। আমি তোমার সাতাশ বছরের—তুমি যখন ক্ষত-বিক্ষত, তুমি যখন বুঝেছ ভালোবাসাকে তুমি অনুভব করতে পার কিন্তু তুমি ছুঁতে পার না তাকে। ব্যাখ্যা করা যায় না এমন সব যন্ত্রণায় তুমি ছটফট করেছ আর মেনে নিয়েছ তোমার সাধের ওই জীবন।—কোনো নারী আমাকে কখনো মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়নি। বরং জীবনের প্রবল ঘূর্ণির ঠিক মধ্যিখানে ছুঁড়ে দিয়েছিল। আমি সেই ঘূর্ণির ভেতরে বসেই খুঁজে দেখতাম জীবন, খুঁজে দেখতাম কবিতা। ছেলেবেলা থেকেই আমি নিজের মধ্যে টের পেয়েছিলাম এক বিস্ময়কর ভালোবাসার, এক বেদনাময়তার, বেঁচে থাকতে চাওয়ার এক তীব্রতার। প্রেমের স্মৃতিবিষ, আমার জীবনেও চুঁইয়ে পড়েছিল। আমাকে বিষণ্ণ আর অবসাদগ্রস্ত করেছিল। কিন্তু, আমি ভালোবেসেছিলাম কবিতাকে।"

চব্বিশ-পঁচিশে আমাকে যা সবথেকে কাহিল করেছিল, তা অসুস্থ হয়ে পড়ার এক ভয়। উন্মাদ হয়ে পড়ার ভয়। ভাবতাম, বাকি জীবনটা হয়তো-বা উন্মাদ হয়েই কোনো পাগলা-গারদে কাটাতে হবে। যে দমবন্ধ জীবনের মধ্যে কোনোরকমে টিঁকে থাকতাম, তা থেকেই হয়তো জেগে উঠেছিল এই বিশাল ভয়। শহরের এ দিকতায় ১৯৭১-এ যে গণহত্যাটা হয়ে গিয়েছিল, আড়াই দিন সে-সময়, বন্ধ ঘরে বসে বসে, আমার স্নায়ু বলতে বোধহয় আর কিছুই ছিল না। শেষপর্যন্ত অসুস্থতা ঘিরে ধরল আমাকে। আমাকে ঘিরে ধরল অনিদ্রা। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে ঘন ঘন যোগাযোগ শুরু হলো। শুরু হলো ওষুধপত্র। কত শত রাত্তিরে মৃত্যুকে আমিও ছুঁয়ে দেখতে চেয়েছিলাম। আর, প্রায় ছুঁয়েওছিলাম। কিন্তু, সমুদ্রের স্রোতের মতো, মৃত্যু

আমাকে সকালবেলায় আবার ছুঁড়ে দিত ফুটপাথে, কোনো নিবিড় ঘরের চৌকাঠে, অথবা কোনো বন্ধুর শান্ত নরম বিছানায়।

'৭১-এ প্রকাশিত হয়েছিল আমার প্রথম কবিতার বই। দশ বছর হয়ে গিয়েছিল, প্রায় দুটো কবিতার বইয়ের পাণ্ডুলিপি তৈরি অথচ কোনো প্রকাশকই ছিল না। যেসব চাকরি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, সে-সব উধাও। দিনের পর দিন অসুস্থতা। ওষুধ। বন্ধু নেই । প্রেমিকা নেই। আমিও ভেবেছিলাম আর ছুটেছিলাম আত্মবিলুপ্তির দিকে। কিন্তু ভীরুতা আর ঐ কবিতা আর জীবনটান আমাকে আবার ফিরিয়ে এনেছিল ঘরে। ভেবে তো ছিলাম, রাস্তাগুলো সব আমার জন্যে ঝকঝকে পরিষ্কার থাকবে, আর আমি তার মধ্যে দিয়ে শুধু হাসতে হাসতে হেঁটে যাব, ব্যাপারটা ঠিক সেরকম নয়। পৃথিবীটা ঐরকম নয়, জীবনটাও ঐরকম নয় ঠিক। তবু তো বেঁচে থাকতে হবেই।

অনেক রাত্রি হয়েছে এখন। আর বাদুড় এসে ঢুকে পড়েছে আমার ছোট্ট ঘরে, আর চক্রাকারে এখন আমার মাথার ওপর ঘুরছে। জানলা দিয়ে আমি দেখছি এখন চাঁদ ঢুকে পড়েছে মেঘের ভেতর। কী বিরক্তিকর মানুষ আমি! এমন শান্ত সুন্দর রাত্তিরে আমি আত্মঘাত বিষয়ে লিখে চলেছি একঘণ্টা-দুঘণ্টা!

আমার তরুণ কবিবন্ধুর কথা বেশ কয়েকদিন মনে পড়ছে শুধুই। “আমাদের হেরে যাওয়া সাজে”? এই একটা মাত্র কথাই আমি বোধহয় পৌঁছে দিতে চাইছিলাম তার কাছে। কিন্তু, কথাটা কি তার কাছে পৌঁছবে? এমন হাসি আমাদের তরুণ কবি আয়ত্তে আনতে পারবে না, কাঁধে একটা পাহাড় থাকলেও যে হাসি কোনোভাবেই, কোনোকিছুতেই, ম্লান হবে না কোনোদিন? নাকি শুরু হবে অবসাদ আর দুশ্চিন্তা আর অনিদ্রা আর আতঙ্ক?

আমরা যেভাবে থাকতে শুরু করেছি, আমাদের ঝামেলাও সেখান থেকেই তীব্রতর হতে শুরু করেছে। কোনো ফাঁকা আশাবাদ নয়, তবু মনে হয়, আমাদের পরবর্তী দিনগুলো নিশ্চয় এতটা নির্মম এতটা ক্ষমাহীন হবে না। তাহলে, ভয় কীসের? ভয় অবশ্য এক রাক্ষুসে উদাসীনতার। শীতলতার। ভারী এক আত্মকেন্দ্রিকতার। আমাদের অধঃপতন বোধহয় শুরু হলো সেদিন থেকেই, মানুষ যেদিন তবলা আবিষ্কার করল আর রাতদিন সেই তবলা একটানা নিরবচ্ছিন্ন বাজাতে থাকল।

১২

দুপুর রোদ্দুরে ফ্রক পরা একটা বাচ্চা মেয়ে, ফাঁকা, সরু গলি দিয়ে দৌড়চ্ছে। তার চুল উড়ছে হাওয়ায়। ঘামে ভর্তি তার মুখ। পা দুটো ধুলোয় ভর্তি হয়েছে। সামান্য একটু উদ্বেগ তার চোখে-মুখে এই বুঝি দাদা ধরল। ঐ তো কিছুক্ষণ আগেই ওখানে দৌড়চ্ছিল রাস্তা-জুড়ে। গেল কোথায়? কোথায় গেল?

দিনগুলো কাটছে 'ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো প্রভু'র মতো। পাহাড়প্রমাণ এক আলস্য আর কী অপরিসীম এক মন্থরতা কাঁধে চেপে বসে আছে। তবুও কিছু একটা কাল রয়ে গেছে কোথাও। কোথাও যাওয়ার কথা ছিল কি? কারো শুকনো মুখে একটু হাত বুলিয়ে দেওয়ার কথা ছিল? জীবনের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখারও এক আনন্দ আছে। পান্তাভাত আর পেঁয়াজ-লঙ্কা নিয়ে বসে পড়া স্রেফ, শুধু বেঁচে থাকার মধ্যেও কী না মজা!

ছেলেবেলার করমচার সব দিন। ...ফলসা গাছের নীচে লাফ-ঝাঁপ দেবার দিন...।

–কোথায় গেল তোমার ছোট বোন?

– ছোট বোন? সে তো অন্ধকার সাঁতরে, এই তো, এইমাত্র কোথায় চলে গেল।
–তোমাকে দেখতে চেয়েছিল।
–হ্যাঁ, আমাকে দেখতে চেয়েছিল। আমি বেরিয়েও ছিলাম বাড়ি থেকে। কিন্তু, কী নিষ্ঠুরতা, কবিতা নিয়ে বড়ো এক কবির সঙ্গে জোর কথাবার্তায় আটকে গিয়েছিলাম সেদিন। ভেবেছিলাম, যাব। কিন্তু যেতে পারিনি। সময় চলে গিয়েছিল।
–ভেবে দেখো, দুটো অক্সিজেন সমানতালে ছুটে চলেছে, আর তোমার ছোট বোন শ্বাস নিতে পারছে না তবুও। বলছেঃ আরো একটু জোর করে দে না।–ভেবে দেখো, কী ভয়াবহভাবে ঐ ভয়ংকর হাসপাতালের ঘরে, একা, সম্পূর্ণ একা, অপেক্ষা করতে হয়েছিল মৃত্যুর জন্যে। পাঁচ মাস অপেক্ষা করতে হয়েছিল। মিশে যেতে হয়েছিল বিছানায়। কাঠির মতো হয়ে যেতে হয়েছিল। বেড নং ৪৯-এর একটা কথা কানে গিয়েছিল ছোট বোনের। "পা দুটো কী সরু হয়ে গেছে, হাঁটতে পারবে না আর কোনোদিন"।–সেজদির কাছে কেঁদেছিল।

একেই বলে পালমুনারি ফাইব্রোসিস। দু'-তিন লাখে মাত্র একজনের হয়। চিকিৎসা তেমন নেই। অবধারিত মৃত্যু। অথচ ডাক্তারবাবুর সহকারীটি বলেছিলেনঃ শুধু নিশ্বাসের পরীক্ষা হবে একটা যন্ত্রে, তারপরেই বাড়ি চলে যেতে পারবে।

আমাদের রাস্তাঘাটে, দোকানগুলোয়, আমাদের ছোট বোনকে আর দেখতে পাওয়া যায় না। 'নিশিদিন ভরসা রাখিস' গানটাও আমাদের ঘরে শোনা যায় না এখন। আমাদের সকলের ছোট বোনেরা আমাদের থেকে এরকমভাবে সরে যায় কেন?
–আমার সঙ্গে কি এক মুহূর্তের জন্যেও তাহলে আর কোনোদিন দেখা হবে না ছোট বোনের?
–না তো! সে আর কি করে হবে?

না হোক, ছোট বোন তো আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়নি। সে তো আমার সঙ্গেই আছে। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, সেও ততদিন আমার সঙ্গে বেঁচে থাকবে। কিন্তু ওকে ছোঁয়া যাবে না কোনোদিন। স্বপ্নে ওকে পরপর কয়েকদিন দেখেছিলাম। দেখেছিলাম সামনে বসে আছে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, ছুঁতে পারছি না। হাত দুটো শুকনো মুখটার ওপর দিয়ে, মাথায় বোলাতে পারছি না কিছুতেই। হাতটা নিয়ে যাচ্ছি আর মুখটা শুধুই ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে।

১৩

আমি ভেবেছিলাম আমার বোধহয় চার-চারটে ফুসফুস আর কত বছর যে আমি সিগারেট ফুঁকছি, আমার সে-সব মনেও পড়ে না আজ।

ব্যাপারটা শুধু এই যে, আমি একটু ভয় পেয়েছিলাম। উদবেগ থেকে, মনোবেদনা থেকে, নিরাপত্তাহীনতা থেকে আমি অনবরত সরে যেতে চেয়েছিলাম। একসময় এমনই এক অসুখ আমার দিকে ধেয়ে আসত, যে অসুখ, একটা হাতিকে রাতারাতি একটি নেংটি ইঁদুর করে দেয়। শেষপর্যন্ত ঐসব অসুখ আমি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে পেরেছিলাম। কিন্তু আমার ফুসফুস দুটো এবার সত্যিই কাহিল হয়ে এল। আমি জানি, এও আরেক ধরণের সাড়াশব্দহীন নাটকীয়তাবিহীন সরে যেতে চাওয়ার পরিণতি। ভয়াবহতা থেকে রেহাই পেতে প্রতিদিন হাজার সিগারেট উড়িয়ে, বানিয়ে তোলা এক তীব্র অসুখ। হ্যাঁ, সেই কবে,

আমিই তো চেয়েছিলাম এই ঝামেলা। আজও সেই ইচ্ছে আমাকে অল্পবিস্তর তাড়া করে।

হাস্যকর ছেলেমানুষি একটা। কাপুরুষতা। দেড়তলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে পা ভেঙে বিছানায় পড়ে থাকার মতো একটা ব্যাপার। খেদ এই, আমার থেকে ইঞ্চিদুয়েক দূরে ছিল আনন্দের দেশ। আমি খোঁজখবর করেছিলাম। ঠিকানাও পেয়েছিলাম তার। কিন্তু, যেতে গিয়েও আমি যে যেতে পারিনি সে-দেশে, সেই দুঃখ প্রতিমুহূর্তেই আমাকে পিষে মারছে।

১৪

সারা পৃথিবীটাই কবিতা দিয়ে তৈরি। একেকদিন, ভেতরকার দরজা জানলাগুলো সব খুলে যায়। হাল্কা হয়ে যায় শরীর। যা-কিছুই আমি দেখি, শুনি, ঘ্রাণ পাই সহসা, মুহূর্তেই তা অভিনব হয়ে ওঠে আমার কাছে। কবিতার বিস্ময়কর পৃথিবীতে উঁকি মেরে আমি দেখেছি, আর বিস্মিত হয়েছি আরো। কত ঝিমিয়ে-পড়া কথাবার্তা, সুগন্ধ, কত চাহনি, স্বপ্ন, দিব্যি লটকে আছে সেখানে।

কেন লিখতে এসেছিলাম কবিতা? ছেলেবেলা থেকেই জীবন আমাকে যারপরনাই বিস্মিত করত। সকলেরই যেমন থাকে, আমার জীবনের পাশেও একটা আলো জ্বলত, মায়াবী এক আলো। আমার মতো–গরীব বাড়ির–এক পাঠবিমুখ ছেলের কাছে, কবিতা এসেছিল এক মুক্তির আশা নিয়ে। মহৎ কবিতা লিখতে পারলে–আঠারো-উনিশ বছর বয়সে বেশ একটু ভুলই ভেবেছিলাম যে–ভালো চাকরি-বাকরি পাওয়া যাবে একটা। নিদেনপক্ষে কোনো খবরের কাগজে। দারিদ্র্য অবশ্য কোনোকালেই ঘোচেনি। তবে আশ্চর্যের ব্যাপার এই, কবিতার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালোবাসার এমনই এক অলৌকিক পর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে, চাকরি-বাকরি নিয়ে আমি তারপর কখনোই আর সেরকম মাথা ঘামাইনি। যেমন, আকাশছোঁয়া খ্যাতির জন্যে আমারও একটা মোহ ছিল একসময়। কিন্তু কবিতার সঙ্গে তীব্রভাবে জড়িয়ে এমনভাবেই কেটেছে আমার গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর, এখন মনে হয়, বিখ্যাত আর বিখ্যাত হতে চাওয়ার মধ্যে একরকম অশ্লীলতা আছে।

নতুন কবিতা লিখব বলে যথেষ্ট সময়ই রেখে দিয়েছিলাম আমি। আয়োজন ছিল, কিন্তু জীবনের অধিকাংশ সময়টাই আমি কবিতা না লিখে কাটিয়েছি। আমার যদি সত্যি কোনো ইতিহাস থাকে, সেটা আমার কবিতা না-লেখার ইতিহাস। সময় পাইনি, এটা ঠিক নয়। সময় কম জেনেও হাজারো সময় কেন যে আমি লিখিনি তেমনভাবে, তা সত্যি আজও আমি জানি না।

আমি কবিতাবাদী। সাধারণতাকে আমি ভালোবাসি। বাতিল, অতি সাধারণ সামান্য সব কথা, দৃশ্য, ফেলে আসা দিনরাতগুলো, আমাকে টোকা দিয়ে যায়। আর তাদের নতুন পোশাক পরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে আমার। বিশাল কোনো মজাকে আমি বোধহয় ধরতে চেয়েছিলাম আমার কবিতায়। ধরতে চেয়েছিলাম বিশাল কোনো হাসির শব্দকে। বিষণ্ণতাকে আমি খুব একটা দূরে সরিয়ে রাখতে পারিনি।তবে, শুধু বিষণ্ণতা, শহর কেন্দ্রিকতা অথবা মনোহর চাটনিই আমার কবিতা নয়। চারপাশের যে জীবন দেখি, আর যে জীবন আমি যাপন করি প্রতিদিন, সে-সবের মধ্য থেকেই কখনো জেগে ওঠে ভাঁজ করা কাগজের নৌকোর মতো একটা কিছু। নানাদিক থেকে তাকে উপস্থাপন করাই হয়তো-বা আমার একমাত্র কাজ। ভালোবাসার ব্যাপকতর রূপকেও যে আমি অনুভব করেছিলাম, সে-কথাও, লেখা থাক এখানে।

কোথা থেকে আসে এত কবিতা? সে কী শুধু ভাঙা জীবন আর ভাঙা চারপাশ থেকে? কোথা থেকে

আসে আমার বিষয়? মেঘের মতো কে আমার মাথায় ভাসিয়ে দেয় কবিতার লাইনের পর লাইন? কে বলে দেয়ঃ "এইরকমভাবে লেখো, ঐরকমভাবে লেখো।" আরে, সে তো আমিই। যে-আমির দেখা পাই না খুব একটা, যে-আমির সম্পর্কে তেমন কিছু জানিও না, যে-আমি সারাদিনরাত সারা বছর আমারই সঙ্গে সঙ্গে থাকে, আমারই সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে, ঘুমোয়, সেই তো এসে হাজির হয় আমার কবিতা লেখার সময়। সে-ই তো বলেঃ "আর ঘুমায়ো না, দেখ চক্ষু মেলি।"

কবিতা কি স্তব্ধতার ভাষা? কবিতা কি জানার মাঝে অজানাকে সন্ধান? জীবন আর মৃত্যুর আলোছায়াময় খেলা? কবিতা কী, আচ্ছা, আমি বলছি।–আলোয় ভর্তি একটা পাহাড়, যে আলো শুধুই হাজার মোমবাতির। মোমবাতিগুলো সব জ্বলছে, আর পাহাড়টা আস্তে আস্তে ডানা ভসিয়ে শূন্যে উড়ছে, আর ভেসে যাচ্ছে। কবিতা আমার কাছে ঠিক এইরকম। আলোয় সাজানো একটা পাহাড়ের ভেসে যাওয়ার মতো। কবিতা সম্পর্কে এর থেকে বেশিকিছু আমি এখনো জানি না, শুধু এই একটা ছবিই দেখি, দেখতে পাই। আর একথাও মনে হয়, জীবনে এই সৌন্দর্যটুকু অনুভব করতে হলে জীবনটাকে ছোট্টো একটা পাখির মতো হাল্কা করে নিতে হবে যাতে তা নীলিমার মধ্যে হারিয়ে গিয়েও মুহূর্তের মধ্যে, ঘরবাড়ির চালে এসে পড়তে পারে। –কবিতা মহাকাশের মতোই রহস্যময়। যে যুগই পৃথিবীতে আসুক না কেন, কবিতা তার নিজস্ব পথ তৈরি করে নেবে। মহাকাশে চলতে চলতেও মানুষ একদিন কবিতা পড়বে।

কবিতা আমার স্নায়ুকে বোধহয় শান্ত রাখে। বেঁচে থাকার জন্যে প্রতিদিন যে ট্যাক্স দিতে হয়, তার নাম নিঃসঙ্গতা। এই নিঃসঙ্গতার বিপজ্জনক রূপ আমি দেখেছি। কবিতা ক্রমশই আরো প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে আমার জীবনে। আমার বেঁচে থাকাটাকে হয়তো-বা একটু সহজ করে দিচ্ছে। অভ্যাসবশত, আমি কোনোদিনই কবিতা লিখিনি। আমার সব কবিতার বই-ই, আমার প্রথম কবিতার বই। প্রথম থেকেই আমার কবিতায় ছাব্বিশ-সাতাশটা পথ খোলা ছিল। পথের কথাটা হয়তো একটু বেশিই লিখলাম। কিন্তু আজকাল ওই প্রত্যেকটা পথেই একটু ঘুরে বেড়িয়ে আসতে ইচ্ছে করে। কোথাও একটা সুন্দর কথা পড়েছিলামঃ "ঠিক সময়ে ঠিক কথা বলার দাম একটাকা, ঠিক সময়ে চুপ করে থাকার দাম দু'টাকা" কবিতা লেখার ব্যাপারে আমি বরাবরই ঐ দু'টাকাটাকেই পেতে চেয়েছি। আমার ছোটো ছোটো কবিতাগুলোকে টানলে, হয়তো যথেষ্টই দীর্ঘ হয়ে যাবে সে-সব কবিতা।

কবিতার কাছে আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ। সব থেকে বেশিরকমের স্বাধীনতা আমি কবিতার কাছ থেকেই নিয়েছি। লক্ষ রেখেছিলাম, ফাঁকা আশাবাদ যেন আমার কবিতায় কখনোই না ঢুকে পড়ে। স্বীকার করা উচিত যে, আমি কোনোদিন কোনো রাজনৈতিক কবিতা লিখিনি। তবু, কেউ যদি হঠাৎ এসে, আমার কোনো কোনো কবিতার দিকে আঙুল তুলে বলেন যে, "ওই তো রাজনীতি, ওই তো রাজনৈতিক কবিতা"–আমি হয়তো সে-সময় তেমন একটা বিস্মিত হবো না। আমি রাত্রিবেলার প্রেমিক। আমার অধিকাংশ কবিতাই রাত্রিবেলায় লেখা। রাত্রি তার সুন্দর দুটি ডানা দিয়ে আমার সামান্য কবিতাকে ছুঁয়ে আছে।

শেষ নেই এমন এক পাহাড়ে অনবরত চড়তে থাকার সঙ্গে কবিতা লেখার তুলনা করা যায় কিছুটা। কবিতা লেখাটা আমি লটারির টিকিট-কাটার মতো ভাবিনি কোনোদিন। আমি চেয়েছিলাম, কবিতা যেন আমাকে নিংড়ে নেয়।

কবিতা লেখার প্রথম থেকেই ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হতো–যে কোনো লাইন থেকেই একটা কবিতা শুরু হতে পারে, আর যে-কোনো লাইনেই শেষ হয়ে যেতে পারে সেই কবিতা। কবিতা হবে আপাতসরল। হাজারমুখো। বিষয়ের কোনো বাছবিচার থাকবে না। আর কবিতার একটা লাইনের থেকে আরেক লাইনের দূরত্ব হবে কমপক্ষে একশো কিলোমিটারের। কিন্তু, অদৃশ্য তলদেশে থাকবে মিলিমিটারের

নিবিড় সম্পর্ক।

তবু একেকদিন ক্লান্তি আসে। অবসন্নতা আসে। ক্ষিপ্রতা যায় হারিয়ে। একেকদিন, উদভ্রান্ত হয়ে পড়ি। মাথা খুঁড়ি। পৃথিবীটাকে দুপুরবেলার হাসপাতালের মতো মনে হয়। গত ত্রিশ-চল্লিশ বছরের কবিতাকে এখনই কেন মনে হবে উনিশ শতকের? কেন মনে হবে, শুধুই প্রতিভার প্রদর্শনী? কোথায় গেল সেই তীব্রতা, সেই ভূতগ্রস্ততা? কবিতা বিষয়ে আজও আমার দু'-একটা কথা জানতে ইচ্ছে করে।

১ কবিতার মতো কবিতা অথবা তথাকথিত কবিতাকে এই মুহূর্তে বাতিল করতে হবে।

২ সমস্ত রকমের শাসন থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে হবে। স্বাধীন করতে হবে। প্রথাবাহিত কবিতা থেকে সরিয়ে নিতে হবে গয়না।

৩ কথার মধ্যে রহস্য আছে, তাকে কবিতা করা যায়।

৪ প্রতিটি মহৎ কবিতা সরল, প্রতিটি সরল কবিতাই মহৎ নয়।

৫ সমস্ত রকম কবিতার শেষে, তীব্র অভিনব এক কবিতা। নতুন একটা পৃথিবী......।

১৫

বরানগরের থেকে বাসে ধর্মতলার দিকে যেতে হলে, বাগবাজারের তিন-চার জায়গায় মুখটা একটু ডানদিকে ফেরালেই, আমাদের গঙ্গা নদীটাকে দেখা যায়। ওদিককার অফিসে যখন কাজ করতাম এক সময়– ভিড়-ভর্তি অফিস-যাত্রীদের বাসে একদিন এক কিশোরের বিস্মিত কণ্ঠস্বর শুনে চমকে উঠেছিলামঃ মাসি, গঙ্গা! আমাদের শহরের পাশ দিয়ে নিঃশব্দে বয়ে যাওয়া নদীটি একসময় আমার খুব প্রিয় ছিল। আমি ছিলাম বেনে-পাড়ার ছেলে, জেলে-পারার ছেলে, গঙ্গা-ধারের ছেলে। কেউ যদি আমাকে এই প্রশ্ন করেনঃ তা, কীভাবে তুমি এতটা বড়ো হলে বাপু?–আমি তো বলবঃ ওই যে নদীটা দেখছেন, ওই নদীটাই কোলে পিঠে করে আমাকে বড়ো করে ছেড়ে দিয়েছে।

সারাক্ষণই গঙ্গায় পড়ে থাকতাম। মোট বারো-চোদ্দবার তো সাঁতরেই গঙ্গা পার হয়ে গিয়েছিলাম। একবার মনে আছে, ঘাড়ব্যথা নিয়ে দলের সঙ্গে সাঁতরে ওপারে গিয়ে–কেউ আর রাজী না হওয়ায় একা-একাই আবার সাঁতরে ফিরে এসেছিলাম এপারে। গঙ্গাপূজোর দিনে, একসময় আমাদের এদিকটায়, দলে দলে সাঁতরে গঙ্গা পার হওয়ার একটা রীতি ছিল। এই দিনটাতে আমাকে ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে রাখা হতো। এমনই এক দিনে, দরজা কোনোরকমে খুলে, আমি যে-বয়সে প্রথম গঙ্গা পেরোই, মা কান্নাকাটি শুরু করে দিয়েছিলেন, চারপাশে একটা হৈ-হল্লা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এসবের থেকেও অবশ্য গঙ্গায় আমার সবচেয়ে ভাল লাগত, টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে মাথা ডুবিয়ে, সেই বৃষ্টির শব্দটাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুনতে থাকা। এরকমই একদিন, মাথা ডুবিয়ে বৃষ্টির শব্দ শুনছি, হঠাৎ জল থেকে মুখ তুলে দেখি ঘাটের সিঁড়িতে মা দাঁড়িয়ে ডাকছেনঃ উঠে আয়। মাকে সত্যিই খুব জ্বালিয়েছিলাম। বাবাকেও। আজ এই নদীটাকে পেছনে ফেলে রেখে কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে। খবরের কাগজের পোকা হয়ে গেছি। চায়ের দোকানের ছারপোকা হয়ে গেছি। আমার পাছাটা একটু তুলে ধরো তো। আর জুতোও।

১৬

পৃথিবীবিখ্যাত বক্সার জো লুই একবার বলে ছিলেনঃ টাকা আমি পছন্দ করি না, কিন্তু টাকা আমার স্নায়ুগুলোকে শান্ত রাখে। কথাটা কোন্ বইয়ে যে পড়েছিলাম। এরকম বলা হয়ে থাকে যে, পৃথিবীর সব থেকে মোটা বইটা আমাদের না-জানা বিষয়গুলো নিয়েই লেখা। সত্য কতকিছুই যে আজও অজানা রয়ে গেল।

বইয়ের সঙ্গে থাকতে হলে, বই যদি ভালো না হয়, তাহলে আমাদের দশা হবে ঠিক একটা স্প্রিং-ভাঙা পুতুলের মতো। অথচ বই থেকে কী না জানা যায়। বই থেকে পড়ে জেনেছিলাম, এরকম অন্তত দুটো অসাধারণ কথা এখনো আমার ছবির মতো মনে আছে। একটা হলোঃ আশাবাদী আর নৈরাশ্যবাদী এই দু'দলই সমাজকে কিছু দিয়ে-থুয়ে থাকে। আশাবাদীরা এরোপ্লেন আবিষ্কার করল তো নৈরাশ্যবাদীরা আবিষ্কার করল প্যারাসুট। আরেকটা কথাও আমি দিব্যি মুখস্থ বলে দিতে পারিঃ ক্লান্তি থেকে পুরুষেরা বিয়ে করে আর কৌতূহল থেকে বিয়ে করে নারীরা। দু'দলই শেষমেশ পস্তায়।

এমন একটা সময় আজ এসেছে , যে সময় আমাদের ভয় দেখায়। মহৎ একটা বইয়ের আয়ুও নাকি আজ খুব জোর আড়াই বছর! কথাটা বিশ্বাস করতে ভালো লাগে না। আমি যখনই বই স্পর্শ করি, তখনই সেই বইয়ের লেখককেও স্পর্শ করি আমি। স্পর্শ করি তাঁর দেশ, তাঁর সময়কেও। মাত্র কুড়ি পয়সার একটা বই নাকি পুরো একটা দেশকে পাল্টে দিতে পারে। ত্রিশ-বত্রিশ বছর আগে ২ টাকা ৮০ পয়সার চটি একটা বই, এক বিকেলবেলা, আমি আনন্দে প্রায় কাঁধে করে বাড়ি বয়ে নিয়ে এসেছিলাম।

একদিন পড়ব, এমন ভাবনায়, আমি কত বই যে কিনে এনেছি। সে-সবের পড়া হলো না তো কিছুই! অথচ আমাদের সময়ের দুঃখিত পীড়িত প্রতারিত তাত্ত্বিক প্রেমিক লেখকদের যথার্থ বন্ধু হতে পারে শুধু মাত্র বই। জ্ঞানী যারা বই যে তাদের একমাত্র বন্ধু, একথা তো আমরা ছেলেবেলা থেকেই পড়ে আসছি। হাজারো বই। হাজারো বইয়ে হাজার হাজার কথা লেখা আছে। যেমন, একটা ফুলস্টপের ওজন ০.০০০০০০০৩৫ আউন্স। আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে বইয়ের সংখ্যা ঠিক কত?–লেখকের? এসম্পর্কেও, আমার ধারণা, ঠিক বইয়ের হদিশ পাওয়া যাবে । বই হচ্ছে, জীবনদায়ী ওষুধ। কে বই পড়ে না? তিন বছরের শিশু থেকে আশি-নব্বই বছরের মানুষ শেষ দিন পর্যন্ত বইয়ের অক্ষরে মুখ ডুবিয়ে বসে থাকে। আমার এক বন্ধু প্রায়ই বলতেনঃ যে বইটা কোন্ বইটা ঠিক জানি না, পাগলের মতো পড়ার জন্য খুঁজছি, পাচ্ছি না। আমার সেই বন্ধুকেই এখন আর খুঁজে পাই না।

একটা ভালো বই, আমি যতটুকু বুঝতে পারি, আমাদের ভালোবাসতে শেখায়। কিন্তু ভালো বই, সেটা লেখা খুব শক্ত, আবার সহজও বটে। আমাদের সময়েই এক বিদেশী কবি, তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেনঃ তুমি যদি অন্য বইয়ের থেকে একটা ভালো বই লেখো, পৃথিবীটা তোমার দরজায় তাহলে ইঁদুরকল পেতে রাখবে। পোল্যাণ্ডের মিৎসকিয়েভিচ আবার বলেছিলেনঃ ভালো একটা বই লেখার থেকে সারাটা দিন কাটানো আরো শক্ত। আমার কাছে অবশ্য ভালো বই লেখা অথবা ভালোভাবে একটা দিন কাটানো দুটোই শক্ত। কোন্টা বেশি শক্ত, সে-কথা যদি সময় পাই, পরে কখনো জানানো যাবে।

১৭

ছেলেবেলা থেকে আমি কম কিছু ঘোড়া দেখেছি তেমন নয় তবু আমার সব ঘোড়াগুলো, আমার মনে হয়, উপহার পাওয়া দুটো পোড়ামাটির ঘোড়া থেকে এসেছে। স্তন নেই এমন অভিশাপগ্রস্ত মাদি ঘোড়াগুলোর সঙ্গেও দিব্যি আলাপ জমিয়েছিলাম আমি। ছুটতে পারে না, আর কিছুটা মনমরা, মানুষের একটু কাছাকাছি এই সব ঘোড়া। সেদিন স্বপ্নে দেখলাম, কোথাকার এক পক্ষীরাজ ঘোড়া আমাদের ফাঁকা রান্নাঘরের ঠিক জানলার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার একটা পা মোটা নারকেল দড়ি দিয়ে জানলার শিকের সঙ্গে বাঁধা। আর বেচারা, মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। উড়তে পারছে না।

ছেলেবেলার ওষুধ-কোম্পানির বিশাল মাঠে হাড়জিরজিরে কিছু ঘোড়া চরতে দেখতাম। ওদের প্রত্যেকের শরীর থেকে, যতটা জানতাম, দরকারি কোনো ওষুধের জন্যে রক্ত টেনে নেওয়া হতো। আর, ওরা ফের তাগড়াই হলে, আবার সেই টেনে নেওয়া হতো রক্ত। এককেদিন ওই মৃত্যুমুখী ঘোড়াগুলোকে বিকেলবেলায় আমি একা একা ঘুরতে ঘুরতে দেখতে যেতাম। আর বিস্মিত হতাম। অবধারিত মৃত্যুর কাছে দাঁড়িয়ে ঘোড়াগুলো কী শান্তভাবে কী নির্বিকারভাবে ঘাস চিবিয়ে যেত।

আমার এক বুদ্ধিজীবী বন্ধু একসময় বাঙালি কবিদের নির্বুদ্ধিতা নিয়ে কথা বলছিলেন। বলছিলেন যে, ঘোড়া আর জাহাজ বাঙালি জীবনের থেকে অনেক দূরে। অভিযোগ করছিলেন তিনিঃ ঘোড়া, জাহাজ, কেন বাংলা কবিতায় হরদম দেখা যাবে।–এত সব শক্ত ভাবনা নিয়ে অবশ্য আমার ভাবা অভ্যেস নেই। আমার কেন যেন মনে হয়, পৃথিবীর ঠিক মাঝখানটায় একটা ঘোড়া স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোতিষ্মান সেই ঘোড়ার কেশর উড়ছে বাতাসে। শুধুমাত্র এই ছবিটা নিয়েই আমি কত যে ভেবেছি দু'পাতা তিনপাতা লেখার। কিন্তু, পঞ্চাশ বছর পেরিয়ে গেল। এখনো মনে হয়, লিখতে শিখলাম না কিছুই।

১৮

"বাবান ডাবান/ কাইচে কাবান।" আমাদের ছেলেবেলার দু'লাইনের এই ছোট্ট ছড়াটা আমাদের ভাইবোনদের কাছে ছিল সব থেকে আনন্দের। কী জানি, ছড়াটায়, কি অর্থ ছিল ওই সব শব্দের। তবে, স্কুল থেকে বাবার বাড়ি ফেরার পথে, বিকেলবেলা, সরু গলি থেকে হঠাৎ বেরিয়ে যখনই বাবা বাড়ির রাস্তায় পড়তেন, বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে-থাকা আমরা কয়েকজন ভাইবোন দূর থেকেই তখন ঐ দু'লাইন চেঁচাতে চেঁচাতে আনন্দে লাফাতাম।

একটা শান্ত স্তব্ধ পরিবেশ সে-সময় কলকাতার চারপাশে ছড়িয়ে থাকত। মানুষজন ছিল এখনকার থেকে কম হিংস্র। ছিটেফোঁটা হলেও তাদের শান্তি ছিল। তারা ছিল নিরীহ, স্নেহপ্রবণ, নির্লোভ আর উদার। আন্তরিকতার অভাব ছিল না কোনো। মেয়েরা ছিল প্রায় আকাশলীনা। সে-সময় দু'চোখে কাজল দেওয়ার বেশ একটা চল ছিল মেয়েদের। আর ছিল, একবিনুনি দু'বিনুনি। অথবা, মাথার পেছনদিকে বিশাল এক খোঁপা। সদ্য গা-ঝাড়া দিয়ে মেয়েরা তখন নেমে পড়ছে অফিস-কাছারিতে। আরো বিচিত্র কত সব কাজে।
আমার মনে পড়ে, প্রেমিক-প্রেমিকাদের হাতচিঠি দেওয়া-নেওয়ার একটা ব্যাপার ছিল তখন আর ব্যাপারটা ছিল হাফছুটির থেকেও উত্তেজনাকর। প্রেমিকেরা ছাতে বা বারান্দায় দু'তিন মিনিটের জন্যেও সপ্তাহে

একদিন প্রেমিকার দেখা পেলে, বেশ কয়েকদিন তা নিয়েই তারা মশগুল হয়ে থাকত।

আমাদের মিউনিসিপ্যালিটির যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন সেই জবরদস্ত ইন্দুবাবুর কালো একটা মোটরকার ছিল। গাড়িটা গ্যারেজ থেকে তার বাড়িতে পৌঁছনোর পথে দু'তিন মিনিট আমরা বাচ্চারা হল্লা করতে করতে গাড়ির সরু একটা পাদানিতে চড়তে পারতাম কোনো কোনো দিন। গাড়ি চড়ে দুপুরবেলা তিনি যেতেন দোকান সামলাতে। আমরা শুনতে পেতাম, কয়লাখনি ছাড়াও, তার সত্যি সত্যি একটা হরিতকীর কলও ছিল। আর ছিল দোনলা এক বন্দুক। সারাবছর আমরা সেই বন্দুকের দেখা পেতাম না, কিন্তু বছরে অন্তত একদিন, বিকেলে, ছাত থেকে আকাশ লক্ষ করে তিনি ঠিক দু'বার গুলি ছুঁড়তেন। আমরা কয়েকজন বাচ্চা বিস্মিত আর চমৎকৃত হয়ে ছাতে দাঁড়িয়ে থাকতাম। গুলি কোথায় ছুটে যেত কে জানে!

ভদ্রলোকের ধুতি আর সাদা আদ্দি-র সঙ্গে তার সাদা গোঁফটা ছিল দেখার মতো। কত দিন যে তার এই বন্দুক ছোঁড়ার ছবিটা আমার বিছানায় ভেসে উঠেছে। আজও মনে হয়, সন্ধেবেলা রাত্রিবেলা ছাদে দাঁড়িয়ে তিনি অনবরত বন্দুক ছুঁড়ছেন। ৭১-এর কাছাকাছি সময়ে, গঙ্গাস্নান থেকে ফেরার পথে, তিনি নকশালদের হাতে বিশ্রী ভাবে জখম হন।

খুবই ছেলেবেলায়, মনে পড়ে, জানলার ধারে বসে থাকতাম। বাইরেটা যেন না-দেখলেই নয়। সকালবেলা বেঁটেখাটো এক রাখালকে দেখতাম, গরুগুলোকে নিয়ে কে জানে সে কোথায় যেত! তার মুখের সারল্য আর মৃদু হাসিটা আজও স্পষ্ট হয়ে আছে। মেথররা আসত কিছু পরে। নর্দমা পরিষ্কার করত। আরেক দলের দু'হাতেই থাকত ঝাঁটা। এমন কিছু তাড়াহুড়ো ছিল না। ধীরে-সুস্থে তারা ঝাঁট দিত রাস্তাঘাট। মিউনিসিপ্যালিটির গাড়ি জল দিয়ে রাস্তা ধুয়ে দিত। সপ্তাহের কোনো কোনো দিন আরেকদল আসত, পিঠে তেল-ওষুধের ট্যাঙ্ক নিয়ে। নর্দমাগুলোয়, রাস্তার ধারে, তেল ছড়িয়ে দিয়ে চলে যেত। ডি ডি টি-র কথা মনে পড়ে। খড়ি দিয়ে বাড়ির দেয়ালে তাদের লোকজন কিছু নম্বর লিখে রাখত। আস্ত একটা রূপকথা যেন। রাস্তার ধারে কিছু দূরে দূরে থাকত ডাস্টবিন। মজার একটা কথা লেখা থাকত সেইসব ডাস্টবিনেঃ ময়লা ছুঁইলে শাস্তি পাইবে। শাস্তি পাওয়ার ভয়ে কিনা জানিনা, আমরা ছোটোরা পারতপক্ষে ঐ ডাস্টবিনের ধারে-কাছে ঘেঁষতাম না।

বিকেলবেলা ছিল শুধু কণ্ঠস্বরের মিছিল। ঝুড়ি-ভর্তি বিস্কুট-ওয়ালা, গোলাপী রাউড়ি, আইসক্রীম আর রাতের দিকে কুলফি মালাই। আর আকর্ষণীয় ছিল তাদের হাঁকডাক। ঐ হাঁকডাক শোনামাত্রই, মনে পড়ে, মা-র আঁচল ধরে টানাটানি করতাম। দলবেঁধে ওরা এখন অদৃশ্য হয়েছে। সকাল-দুপুরের কাগজ-ওয়ালারা বোধহয় শুধু রয়ে গেছে এখনো। কাঁসা-পেতল থালাবাসনের ফেরিওয়ালা বা কাপড়-চোপড় বিক্রি করার ফেরিওয়ালাদেরও এখন আর দেখি না। শুধু এদের নিয়েই থাকতে পারত কোনো স্বল্প দৈর্ঘ্যের ফিল্ম। আমিই বা শুধু নেই নেই করছি কেন? পড়ার জন্যে রাধাপ্রসাদ গুপ্ত-র বইটা কি নেই?

তবুও যদি কেউ প্রশ্ন করেন আমাকেঃ কী আর তেমন দেখলে তোমরা কলকাতার। আমি যে কলকাতায় গ্যাসের আলো জ্বলতে দেখেছি অনেক সন্ধেবেলায়—দেখেছি, কাঁধে মই নিয়ে ভাবলেশহীন মুখের এক মানুষ এসে দেশলাইকাঠি জ্বেলে, আলো জ্বেলে দিত ল্যাম্পপোস্টগুলোয়, আর সেই আলোয় যে দিব্যি আনন্দেই থাকতাম আমরা, সেই কথাটা ভেবেই তো আমি এখনো বিস্মিত হই। বাড়িতে জ্বলত হ্যারিকেন আর কুপি, সেই আলোয় বারান্দায় বই খুলে রেখে মাছভাজার মনোমুগ্ধকর গন্ধ পেতাম। আর ছিল রোমাঞ্চকর টেলিফোন আর রেডিয়ো। দূরের কোনো বাড়িতে টেলিফোন বেজে উঠলেই, একটা উত্তেজনা হতো, আকশ-পাতাল ভাবতাম, আর রাত্রি সাড়ে-দশটায় একবার রেডিয়োয় গান শুনতে তো দিদির সঙ্গে পাশের বাড়িতেই গুটিগুটি হাজির হয়ে গিয়েছিলাম।

সেই সময়ে সাদা পোশাক আর মাথায় লাল টুপির সঙ্গে কালো ঝালর আর কালো বুটজুতো ছিল আমাদের কাছে একই সঙ্গে ভয়ের ও বিস্ময়ের। রাস্তা দিয়ে কোনো পুলিস হেঁটে যাচ্ছে, এটা ছিল আমাদের কাছে রীতিমতো একটা দৃশ্য। তাদের হাতে থাকত মোটা ছোটো একটা লাঠি। তাদের হাঁটাচলার মধ্যে এমন কিছু একটা ছিল যা আমাদের সবসময়েই একটু তফাতে তফাতে রাখত। বুকে ঢিপঢিপ শব্দ নিয়ে আমরা যতক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায়, তাকিয়ে থাকতাম সেই দৃশ্যের দিকে।

আমাদের বাড়ির কাছাকাছি এক ওষুধের কারখানা ছিল। আর তাদেরই ছিল একটা এক্কা গাড়ি। প্রায়ই ওই গাড়িটাকে বাসরাস্তা দিয়ে আমরা ছুটতে দেখতাম। কে ওই গাড়িতে বসে থাকতেন সে-সব জানার আগ্রহ আমাদের তেমন ছিল না। আমাদের আগ্রহ ছিল গাড়ির পেছনদিকের ফাঁকা জায়গাটা যেখানে আমরা কোচোয়ানের ছিপ্‌টির সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে চেপে বসতাম। আর এমনিভাবেই গাড়িটা চড়তাম। ছিপ্‌টি খেয়ে কতদিন যে রাস্তায় পড়ে গেছি—গেছি তো গেছি—হাত-পা ঝাড়তে ঝাড়তে আবার আমরা ছুটতাম ঐ গাড়িটার পেছন পেছন।

কলকাতার রাস্তাঘাটগুলোর সঙ্গে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল আমার। চেয়ে চেয়ে দেখতাম দুপুরবেলার বিকেলবেলার ঘুমন্ত সব রাস্তা। ছায়াছন্ন।রাস্তার ফাঁকা বাঁকগুলো যে কী অসীম রহস্যময়তায় ছড়ানো। কুড়ি-বাইশ বছর বয়সে কাছ থকে দেখেছিলাম ঐরকম দু'-একটা রাস্তাঘাট। নারীর মতো কি? বন্ধুর মতো কি? রাস্তাগুলো কি সত্যিই ডাক দিয়েছিল আমাকে? কোথায় যেতে চেয়েছিলাম আমি?

আমাদের ছেলাবেলার সেই কলকাতা আর নেই। আমাদের চোখের সামনেই সেই কলকাতা আস্তে আস্তে পাল্টে গেল। "আরে, তুমি আদমি না পাজামা?" এইসব কথা এখন আকচার শোনা যায় রাস্তাঘাটে, দোকানে। আমাদের ছেলেবেলায় যেমন দেখতাম শান্ত সমাহিত সাদাচুলের সব বৃদ্ধদের মুখ, যাঁরা বলতেনঃ সন্ধে হয়ে গেছে, আলো জ্বলে গেছে, বাড়ি ঢুকে পড়ো।—তাঁরা সব গেলেন কোথায়, তাঁদের আর দেখি না তো! কলকাতায় সাদা চুলের মানুষ দেখতে পাওয়া এখন সত্যিই একটা ঘটনা। বয়স্ক কালো চুল আর পাকা মুখে গিজগিজ করছে কলকাতা। স্বাভাবিক জীবনযাপন, একটা শান্ত সুন্দর নিয়মে-বাঁধা জীবনযাপন, অস্বাভাবিক জীবনযাত্রার থেকে আমার তো মনে হয়, আরো অনেক বেশি শক্ত। স্বাভাবিক জীবনযাপন, স্বাভাবিক কাজকর্ম, আমরা অনেকদিন হলো স্বাভাবিকভাবে আর করতে পারি না। আমরা অনেকদিন আগেই অস্বাভাবিক হয়ে গেছি।

কলকাতার সেরা আকর্ষণই কলকাতার মানুষজন। বিস্মিত হবার মতো তাদের প্রাণশক্তি, তাদের আড্ডা, সাহিত্যপ্রীতি, পাগলামি, স্ল্যাং। কারা তবু কলকাতাকে বুকপকেটে নিয়ে আজকাল ঘুরে বেড়াচ্ছেন, যাদের চেহারা অনেকটা রবিবারের সকালের মাছের বাজারের বিড়ালের মতো, মা দুর্গা যাদের চুলের মুঠি ধরলে বেশ মানিয়ে যায়। রবিবার আর ছুটির দিনের সকালগুলোয় তারা হরদম মিটিঙ খুঁজে ফেরেন। হাজারো ধুলো আর হাজারো প্রতিশ্রুতি ভাসতে থাকে কলকাতার আকাশে-বাতাসে।

মিনিটে মিনিতে এত যে বলিঃ শুয়োরের বাচ্চা—মুখ ফুটে কাউকেই বলতে পারি না তো! সেদিন এক চিত্রপ্রদর্শনীতে আমাদের এক হোমরাচোমরা কবির সঙ্গে দেখা। জিগ্যেস করলামঃ কেমন আছেন?—তিনি কথাটা না-শোনার ভান করলেন। দ্বিতীয়বার, তিনি আমার মুখের দিকে নিরুত্তর তাকিয়ে রইলেন শুধু। তৃতীয়বার, মুখ ফিরিয়ে তিনি সরে গেলেন ঘরের অন্যদিকে। বুঝতে পারলাম, আমাকে অপমান করতে চাইছেন তিনি। কী আর করা যাবে।—এমনও হয়?—হ্যাঁ, এমনও হয়। কলকাতায় বেরনো আর অপমানিত হওয়া আর জ্বরের মধ্যেও ভেসে ভেসে উঠতে থাকা সেই অপমানের ছবি, তা দেখতে দেখতেই তো বয়স হয়ে এল।

কিন্তু, উল্টোপিঠের কোনো ছবি কি একেবারেই নেই? সেও তো আছে। কলকাতা ছাড়া কে আর দেবে শান্তি আর আশ্রয়?–বছর পঁচিশ আগে, শীতের এক রাত্তিরে, ফাঁকা রাস্তাঘাট দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। আকাশে সেদিন তারা ছিল কিনা আজ আর মনে পড়ে না। তবে মনে পড়ছে যেন কুয়াশা নেমেছিল। রাস্তার মাঝখানে এক সামান্য গর্তে আমি সহসাই দেখেছিলাম সেদিন চার-পাঁচটা কুকুরছানা এ-ওর গায়ে উঠে, জড়িয়ে, শীত কাটাচ্ছে। আর হয়তো-বা ঘুমোনোরও চেষ্টা করছে। ফাঁকা রাস্তায় আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, মনে পড়ে, ঐ দৃশ্যটা দেখেছিলাম সেদিন। কী একটা পরিচিত কথা আবছাভাবে ভেসে উঠছিল দৃশ্যটা থেকে। এই একটা দৃশ্য সেদিন রাত্রিবেলা আমার জীবনে যে আনন্দ এনে দিয়েছিল, সে-কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। হয়তো একটু বেশি কষ্টই পেয়ে গেলাম জীবনে। কিন্তু, আনন্দ? আনন্দও তো তেমন কম ছিলনা কিছু। আনন্দর কথা বলতে, ছেলেবেলার সেই ঢোল আর নাচ আর গানের কথা মনে পড়ল। নাঃ, "ও দিদি গো, কার হলো গো", আজ পর্যন্ত এই গান আর নাচের ধারে কাছে তেমন কোনো নাচগান আর শুনলাম না।

১৯

শেষ পর্যন্ত আমার জীবনে যদি কোনো লক্ষ্য থেকে থাকে, তা হলো, আত্মহত্যা না করা।

এই মহাশূন্যতা যেমনভাবে পৃথিবীটাকে ছুঁয়ে আছে, সেইরকমভাবে কি ছুঁয়ে থাকা যায় না এই জীবনটাকে?

এ নয় যে, বড়ো ঝামেলার, বড়ো ঝড়-ঝাপটার, ক্ষতি-ভর্তি এই জীবনটাকে আমি সাজিয়ে তুলতে চাইছি খুব। আমি চাইছি জীবনটাকে সহসাই শেষ-না-করে-দিতে। আমি ছিলাম বোবা এক মানুষ। ঘরে বোবা, বাইরে বোবা। আমি আস্তে আস্তে কথা বলতে শিখেছি এখন। "বাঁচাও" বলে আমি আজকাল চেঁচিয়ে উঠি না। সাহায্যের জন্যে কান্নাকাটি, সত্যি, কী যে জঘন্য এই ব্যাপারটা! আমি নিজেকে এখন আর ভয় পাই না। আমার একলা হয়ে পড়াটাও আমি আজকাল নিঃশব্দে দেখতে পাই আর দুঃখিত হয়ে পড়ি না তার জন্যে। আমার জীবনকে ঘিরে, মৃত্যুকে ঘিরে, কবিতাকে ঘিরে সমস্ত প্রশ্নের আমি ঠিকঠাক উত্তরগুলো দিতে পারি এখন। জ্ঞানী হয়ে উঠলাম নাকি? "সংকটের কল্পনা" থেকে আমার ব্যাপারটা কল্পনার সংকটের দিকে চলে গিয়েছিল। আমি তাকে মেরামত করেছি। ঠিক জায়গায় ফিরিয়ে এনেছি। জীবন যখন প্রায় শেষ হতে চলেছে, তখনও কি এসবের খুব একটা প্রয়োজন ছিল। আমি বলবঃ নিশ্চয় ছিল।

মাস ছয়েক আগে আমার ডাক্তারবাবু আমাকে বললেন একদিনঃ তোমার স্মৃতি খানিকটা নষ্টই হয়েছে। সে-কথা আমারও মনে হচ্ছিল বেশ কিছুদিন ধরে। আমাদের বিখ্যাত এক লেখকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে তাঁর নাম আমি, এই সেদিন, মনে করতে পারছিলাম না।! তাহলে বছর চোদ্দ-পনেরো হলো, তুমুল এই প্রতিযোগী মানুষজনদের সঙ্গে আমি একটা কম্‌তি মাথা নিয়ে চলেছি। বিদ্যুতের কি সত্যিই ছোঁয়া লেগেছিল আমার মাথায়? সেই জালে ঘেরা বাড়িতে যখম চিৎ হয়ে পড়েছিলাম টেবিলে, বিদ্যুৎ কি সত্যিই সেঁধিয়ে দিয়েছিলেন আমার ডাক্তারবাবু আমার মাথার ভেতরে? এই জন্যেই কি আমি সব ভুলতে ভুলতে চলেছি? অথবা কলকাতায় যেমন ভাসে কথাটা, অতিরিক্ত মদ্যপান আর ওষুধপত্রই হয়তো ডুবিয়েছে আমাকে। এই নিয়ে আমার আর তেমন মাথাব্যাথা নেই। হতাশও নই আমি। শুকনো পাতার মতো একটা কথা তবু উড়তে উড়তে আমার মাথায় এসে ধাক্কা মারে।–যদি ভুলে যাই, যদি ভুলে যাই আমি আমার

ভাষা? যা কিছু আমি ভালোবেসে শিখেছি এতদিন, যা-কিছু আমি প্রতিদিন, রহস্যময়ভাবে আস্তে আস্তে জেনেছি, যদি ভুলে যাই? যদি ভুলে যাই আমি আমার গান? ভালোবাসা? যদি ভুলে যাই আমি আমার নদীর পাশের শহরটাকে? সেই শান্ত নীরব নদীটাকে? যদি ভুলে যাই, দুটো হাত? যদি ভুলে যাই, যদি ভুলে যাই আমি আমার নাম, ডাকনাম? যদি ভুলে যাই আমার মেয়ের মুখ? যদি ভুলে যাই জামরুল, আমার ছেলেবেলা? যদি ভুলে যাই, যদি ভুলে যাই আমি আমার ঘরে ফেরার পথ? শিউলিফুল? যদি ভুলে যাই আমি সব ক'টা দিক?

—ভুললে, ভুলব। আমার আর কী, আমি সন্ধেবেলা-রঙের ফিঙে পাখি হয়ে যাব একটা, আর উড়তে থাকব, আজীবন উড়তে থাকব ছোট্টো একটা ঘরের দিকে যেখানে আলো-অন্ধকারে আমার মা লালপেড়ে শাড়ি পরে উদ্বেগভরা মুখে বসে থাকতেন, যেখানে বাবা ছড়া বানাতেন মুখে মুখে, যেখানে আমার মেয়ে আনন্দে দুলতে দুলতে ছুটে আসত আমার দিকে—কারিগর, ও আমার কারিগর—ওকে শিমূলতলা বেড়াতে নিয়ে যাব কবে?

২০

বাজারে হঠাৎ সুমন্তর সঙ্গে দেখা। আমি তো ভেবেছিলাম সুমন্ত কবে ফেঁসে গেছে, মরে ভূত হয়ে গেছে কবে। হালকা কুয়াশার মতো ঝুঁকে সে তরি-তরকারি দেখছিল। ঝিঙে-ঢ্যাঁড়সের দিকে, কানা বেগুনের দিকে, তার পেল্লাই দুটো চোখ ঘুরছিল। দোকানের কোনা থেকে ছোটোখাটো একটা লাউ আলতোভাবে তুলে নিয়ে সে দেখছিল। আর ঠিক তখনই, আমাকেও দেখল সুমন্ত। যদিও, অবাক হলো না তেমন। বললঃ এই যে খেলাপাগল, কত বড়োটি হয়েছ দেখি। মৃত্যু কি তোমাকে এখনো জ্বালাতন করে?

—মৃত্যুকে একসময় বড়ো বেশি সমীহ করা হয়ে গেছে সুমন্ত। আমি এখন বেদনামুক্ত। স্বাধীন।

—সুমন্ত, অন্ধকারে অনেকটাই ঘুরতে হলো আমাকে। আমি চেয়েছিলাম নির্ভার একটা জীবন যেখানে কোনো মৃত্যুবেদনা থাকবে না। শেষপর্যন্ত, আমি তা পেয়েছি। মৃত্যুভাবনা আমাকে আর টস্‌কাতে পারে না। সত্যকে অনুভব করার মতো সামান্যজ্ঞান আমি মিশিয়ে নিয়েছি জীবনে।

আমিও বিন্দুমাত্র না ঘাবড়িয়ে বললামঃ আমি এখনো লিখি সুমন্ত। আমার লিখতে ভালো লাগে। লিখলে, আমি ভালো থাকি। বছর তিনেক আগে অবসাদ আমাকে বেশ চেপে ধরেছিল। আমি ভেবেছিলাম, লেখালেখিটাই হয়তো এই অসুস্থতার উৎস। আর ভেবেছিলাম, আমি আর লিখব না। নিজের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। নিজেকে টেবিলে ফেলে দেখেছিলাম, প্যাঁচ আছে। বিখ্যাত হওয়ার এক প্রবল ইচ্ছে তখনো উঁকি মারছে। অথচ বছরখানেক, তেমন কিছু না লিখেও দেখেছি, সবকিছু কেমন যেন অর্থহীন লাগে। চোয়াল ভারী হয়ে ওঠে। বিস্বাদ হয়ে যায় মুখ। আমার লেখালেখি তবুও, সুমন্ত, স্তব্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। হেরেই গেলাম হয়তো। বাহান্ন চলছে। কোনো স্বীকৃতিই জুটল না।

—তা, স্বীকৃতিটা তোমাকে দেবে কে, শুনি। তোমার মতো লোকেরাই একলা হয়ে পড়ে। এ কেমন একটা যন্ত্রণা তুমি মাথায় নিয়ে ঘুরলে সারাজীবন যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই?

শহরতলির বাজারে ভিড়টা একটু কমে আসছিল। বাজারের নোংরা, বরফ, রক্ত, বিড়াল, মাছের মাথা, মাছের বঁটি পেরিয়ে কথায় কথায় আমরা একটা চায়ের দোকানে ভেসে এসেছিলাম। সুমন্ত আমার অনেক দিনের বন্ধু। তার সঙ্গে আমার দেখা হতো সবচেয়ে কম কিন্তু কথা হতো সবচেয়ে বেশি। চায়ে চুমুক দিতে

দিতে আমি বললামঃ মুখ ফিরিয়ে যা বলার ছিল তা আমি কোনোদিনই বলিনি সুমন্ত। জীবনে তেমন কিছু চাওয়ারও তো ছিল না। লিখতে লিখতে চলেছিলাম। বলার কিছু না থাকলে, বসে পড়তাম। শুধু, একটু-আধটু অভদ্র হতে বড়োই ইচ্ছে করে আজকাল।

–তুমি তো জানো, নিজেকে প্রতিভাবান ভাবার একটা মেজাজ আমার আছে। একসময় আমি ভেবেছিলাম, সুবিচারের আশায় দরজা-বন্ধ ঘরে বসে না থেকে জেলে বসে মরা অনেক ভালো। ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল সময়টা, ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছিল মানুষজন। আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। জেল থেকে বেরিয়ে, একবছর আমার গলা থেকে স্বর প্রায় বেরতো না। তাই বলে, আমার লাউ থেকে চিংড়ি সরে গেছে বলে ব্যক্তিগতভাবে আজ আমার দুঃখ নেই কোনো।

–সুমন্ত, ঘড়ির দোকানে বসে বসে আমিও আর সময় কাটাই না। আমি শেষপর্যন্ত আমার মতো হতে পেরেছি। ভেবে দেখেছি, ঘুমোতে চাইতাম না বলেই একসময় ঘুম হতো না আমার। মৃত্যু আমাকে আর বিরক্ত করতে পারে না। আমার লিখতে ইচ্ছে করে। আমার লিখতে ইচ্ছে করে জ্যান্ত, অভিনব সব কবিতা।

–সে তো ভালোই। কিন্তু তোমার বড়ো অপরের কথা শোনার বাতিক। উপাচার্যদের চালাক চালাক কথা তুমি শুনো না যেন।

–না, সে-রকম নয় কিছু। সেদিন রবীন্দ্রনাথ পড়ছিলাম। 'জীবনমরণ' কবিতাটার মাঝখানের ওই যে চার লাইন, 'এমন একান্ত করে চাওয়া/ এও সত্য যত, / এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া/ সেও সেইমতো'। এই চার লাইনে সেদিন আটকে গেলাম। ছেলেবেলায় তো মুখস্থই ছিল এইসব লাইন। আজ মনে হচ্ছে, এসবের গুরুত্ব না দিয়েই তখন উলটে গিয়েছিলাম পাতাগুলো। এখনকার উপলব্ধিটা যদি চৌত্রিশ/ পঁয়ত্রিশ বছর আগে হতো, তাহলে জীবনে অন্তত এতটা নাজেহাল হতাম না। রবীন্দ্রনাথকে, ছেলেবেলায় কোনো ভুল কারণে মনে হতো, শুধুই প্রণয়-কাব্যের কবি। রবীন্দ্রনাথ যে একাই একটা সুন্দর জাগরণ...

–দেখো, ঐসব বোলো না। জাগরণ-টাগরণ রাখো। আর তোমার থেকে এসব কথা আমি শুনবই বা কেন? তুমি তো সাহিত্যের ইতিহাসের জামায় আস্তিন ধরে ঝুলছ বেশ, একুশ শতকে হয়তো ফুলে ফেঁপে পড়বে গিয়ে একেবারে বিখ্যাত সব মৃত কবিদের মধ্যে। কিন্তু যে গণহত্যাটা ঘটে গেল বরানগরে, ভেবেছিলাম তার প্রতিবাদে তুমি বরানগরটা ছেড়ে নিশ্চিত চলে যাবে। তেমন কিছুই তো তুমি করলে না!

–সুমন্ত, এটা তো তোমার বোঝা উচিত, ওই গণহত্যার সমর্থনকারী নই আমি। তুমি যা বলছ, সেটা একটা, অতিনাটকীয় ব্যাপার। আর এই অতিনাটকীয়তাকে আমি জীবনে জায়গা দিতে চাইনি কোনোদিন। লেখা ছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারি না। আর তাছাড়া, কোথায়-বা যেতে পারতাম আমি? শ্যামবাজার, ওয়েলিংটন বা উল্টোডাঙার ফুটপাথে শুয়ে থাকতে আমার আর ভালো লাগে না।

–আচ্ছা, ঠিক আছে। আজ উঠি। এরকমই অন্ধকার চায়ের দোকানে অথবা বাজারেই হয়তো আবার দেখা হয়ে যাবে কোনোদিন। আড্ডা আমাকে একটু ডুবিয়েছে আজ। আমার এখন কয়লা খুঁজতে যেতে হবে।

কথাটা বলে সুমন্ত উঠে পড়ল। দুপুর বারোটার ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে আমি তাকে কয়লার খোঁজে ক্রমশই মিলিয়ে যেতে দেখলাম।

২১

কলকাতার রাস্তাঘাটে আমি প্রায় প্রতিদিনই কিছু একটা খুঁজে বেড়াই। হয়তো আবিষ্কার করতে চাই কিছু। দৃশ্যগুলো যখন ঝিমোতে ঝিমোতে অলীক একটা রূপ ধরে, সেই দৃশ্যগুলোকে আমি তখন যত্নে নিয়ে আসি বাড়িতে। আমি জানি না, এসব আর কারো কাজে লাগে কিনা।

এমনতরো কত যে কাজের সঙ্গে আমি জড়িয়ে রয়েছি। এই তো আমার আজ সন্ধেবেলার কাজ হচ্ছে, ভীড়-বাসে নিজেকে তুলে-দেওয়া, আর যাদবপুর পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাওয়া নিজেকে, আর শেষমেশ ওই বাসেই বাড়ি ফিরে আসা।

একুশশতকের দিকে হাঁ-করে তাকিয়ে থাকা, এই আরেকটা কাজও আজকাল এসে জুটেছে আমার কাছে। বিরক্তি আমায় তেমন ঘায়েল করতে পারেনি কোনোদিন। তবুও মনে হয়, আমি সেই দুর্ভাগাদের একজন যার দু'চোখ দিয়ে জল পড়ে না। দু'হাজার বছরেরও আগে, চুয়াংৎসে, আমাকে লক্ষ করেই বোধহয় বলেছিলেনঃ একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে গান গাও; কিংবা টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ো।

২২

বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ যদি পিছিয়ে যেতে পারতাম, তাহলে আজ হয়তো তোমাকে লিখতাম সুন্দরীঃ তোমাকে আজ সারাদিন ধরে একটাই চিঠি লিখতে ইচ্ছে করছে। যদি লিখতাম সত্যিই লিখতামঃ আমার বলতে ইচ্ছে করে তোমার নাম, কুসুমকলি। তোমার নাম, তরী। আমার দুটো ডানায় আজ শুধুই তোমাকে ঘরবাড়ির ওপর দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করছে। আমার সেই সুন্দর সময়ের তীব্র ভালোবাসার ভেতরে তোমার হাসির শব্দ কোথাও লেগে আছে। যেসব ধারালো কথা সুন্দরী তোমাকে সহজেই বলতে পারতাম সে-সব দিন, কেন জানি না, সে-সব কথা কিছুই আমি তোমাকে বলিনি কখনোই। কতবছর যে আমি তোমাকে খুঁজেছিলাম। কত লালমুখো সুন্দরীকে টুসকি মেরে পাশে সরিয়ে আমি পৌঁছেছিলাম তোমার কাছে। সাতাশ বছর বয়সেই আমার গা থেকে হয়তো মৃতদেহের গন্ধ বেরিয়েছিল, শামশের আনোয়ারের মতো, তুমিও হয়তো টের পেয়েছিলে তার। হয়তো ভয় পেয়েছিলে। অর্ধেক তুমি মেনে নিয়েছিলে আমাকে, বাকী অর্ধেককে নির্বাসনে পাঠিয়েছিলে।

একবিন্দু চোখের জল যা সাত সমুদ্রের জলকেও ম্লান করে, তা কোথায়? ঢেউখেলানো যত গান আমি গেয়েছিলাম, তাও ব্যর্থ আর উধাও। আরো একটা সময় এসেছিল যখন রবিঠাকুরের বইয়ের পেছনে থাকত জিনের পাঁইট, আর সন্ধেবেলায় গেলাস নিয়ে বসে-পড়ার একটা ব্যাপার, সে-সব দিনগুলোও আজ ভাসতে ভাসতে হয়তো কোন্নগর পানিহাটির দিকে অদৃশ্য হয়েছে। আমার বইয়ের টেবিলটা হয়তো কখনো পরিষ্কার হবে না আর। ঘরটাও হয়তো থেকে যাবে এরকমই। কর্কশ। হয়তো জামা-পাজামা পরেই আমাকে একদিন ছুটে যেতে হবে সমুদ্রে। তাজা নিশ্বাস কুড়িয়ে আনতে হবে কিছু।

মেয়েরা হচ্ছে সুগন্ধের বুনুনি। মেয়েদের ভাষণহারা আন্তরিকতা আমারও ভালো লাগত খুব। জুটেওছিল তেমন আরেক বান্ধবী যে আমাকে বলত বিয়ের রাতে সে তার কর্তাবাবুটিকে বলবেঃ আমাকে একদিন প্লেনে চড়াবে?–সেই মেয়েটিই একদিন এক সকালবেলায়, বলা-কওয়া নেই, সহসাই, রিক্সায় আমাকে নিয়ে এক মন্দিরের সামনে হাজির। বললঃ নামো, আমরা বিয়ে করব! আমি অনুভব করেছিলাম,

জীবনে এর থেকে তো বেশি কিছু পাওয়ার থাকতে পারে না। কিন্তু ব্যাপারটা ছিল যে কী অসম্ভবের। আমি পিছিয়ে এসেছিলাম সেদিন। দুশ্চিন্তায়। আজ ভাবি, একটা মূর্খকে আমি কীভাবে বাঁচাব বারবার?

আমি একটা গাছ/ তুমি আমার পাতা–লিখতে লিখতেই, আমার সময়টা প্রায় চলে গিয়েছিল। তারপর গুটিগুটি তিনি এলেন। শ্রীমতী। বললেনঃ আপনার কবিতা...। বললামঃ দিন বারোর মধ্যে বিয়েটা করতে পারবেন? বিয়ে হলো, অবশ্য বারো দিনের মধ্যে নয়। তারপর সেই বৃদ্ধ দার্শনিক যেমন বলেছিলেনঃ বিয়েটা, ভালো তো ভালো, নাহলে দার্শনিক হওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকে যায়।–আমি এখন সেই দার্শনিক হওয়ার এক সুন্দর সম্ভাবনার মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

২৩

কী দ্রুতবেগে সমস্তকিছু উড়ে চলেছে এখন। বইগুলো উড়ে যাচ্ছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন ঔপন্যাসিক, দু'হাত দিয়ে শূন্যতাকে আঁকড়ে ধরতে চাইছেন তিনি, আর উড়ে যাচ্ছেন। আমার মাথার কাছে গির্জার মতো দাঁড়িয়েছিল একটা পোড়া মোমবাতি, একনিমেষে কোথায় যে উড়ে গেল! আমার তিনতলার ঘরটা নীলিমার ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে। নদীটা উড়ছে আকাশের দিকে। শহরটা গ্রামের ভেতর দিয়ে উড়ে চলেছে। আমাদের মুখগুলো সব কোথায় গেল! আগুনমুখো এক দারিদ্র্য হাঁ-করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। কে আমাকে ডাকছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। 'আমরা কুকুর-বিড়ালের মতো বেঁচে আছি' কথাটা উড়তে উড়তে একটা উঁচু নারকেল গাছের মাথায় ধাক্কা খেল। 'তুমি আমার ঘুম ' প্রেমিক বলছে তার প্রেমিকাকে, আর উড়ে চলেছে। ধুলিমুখোশ পরা একটা লোক আমার সামনে দিয়ে উড়ে যেতে যেতে বললঃ চললাম। যে কবিতাটা আমি লিখেছিলাম, কোথায় আরম্ভ হয়েছিল ,আমি ভুলে গেছি, কোথায় শেষ হবে তাও আমি জানিনা। রাজ্যের সইসাবুদগুলো এখন উড়ে চলেছে, করমর্দনগুলো ধন্যবাদগুলো উড়ে চলেছে। চীনেমাটির পুতুলগুলো উড়তে উড়তে বলছেঃ আমাদের ধরো। মহাসর্বনাশ একটা ঘটতে চলেছে বলে যদিও মনে হচ্ছে, তেমন কিছুই নয় ব্যাপারটা। বাচ্চারা আনন্দে চীৎকার করছে। হাসছে। ভয় পাওয়ার নেই কিছুই।